কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে

শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ

ডি, এম্, লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট। কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ
১৬ আষাঢ় ১৩৬৩

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম্, লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট। কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
দি ইণ্ডিয়ান ফোটো এন্‌গ্রেভিং কোং (প্রাইভেট) লিঃ
২৮ বেনিয়াটোলা লেন। কলিকাতা-৯

প্রাপ্তিস্থান
ডি, এম্, লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট। কলিকাতা-৬

শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ
আম্রপালি
২০৪ বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। কলিকাতা-৩৫

দাম দু'টাকা

সত্যসখাদাদাকে —

স্নেহের মিন্নি ।



রবীন্দ্রনাথ

(শশী ভিলা, বরাহনগর, ১৯৩২)

ভূমিকা

১৯৪০ সালে কবি কালিম্পং থেকে অসুস্থ হয়ে ক'লকাতায় এলেন। তখন কিছুদিন খুবই বাড়াবাড়ির পর একটু ভালো হয়ে শান্তিনিকেতন চ'লে যান। তারপর কখনো ভালো কখনো খারাপ এইরকম ক'রে চলছিল। ১৯৪১এর জুন মাসের মাঝামাঝি আমি নিজে অসুস্থ হয়ে গিরিডি যাই। কথা ছিল কিছুদিন আমরা গিরিডিতে থাকব। কয়েকদিন পরে রথীবাবুর চিঠি পাওয়া গেল যে কবির শরীর মোটেই ভালো নেই। সকলেই সেজন্যে বিশেষ চিন্তিত। এই খবর পেয়ে আমরা গিরিডিতে বেশিদিন থাকার কল্পনা ছেড়ে দিয়ে ২রা জুলাই মোটরে শান্তিনিকেতন রওনা হলাম। আমার স্বামীর কলেজ খুলে গেল ব'লে তিনি বর্ধমান থেকেই আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে নিজে ক'লকাতা চ'লে এলেন, আর আমি কবির কাছে গিয়ে তাঁর অস্ত্রোপচারের জন্য তিনি যখন ক'লকাতা আসেন সেই সঙ্গেই ক'লকাতায় ফিরি। কবির জীবনের সেই শেষ ক'টা দিনের ছবি মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

৫ই জুলাই সন্ধ্যেবেলা কবির কাছে ব'সে আছি এমন সময় আমার স্বামী এসে ঘরে ঢুকলেন—ক'লকাতা থেকে এসেছেন কবিকে দেখতে। ওঁকে দেখেই আমার দিকে ফিরে বললেন, "চ'লে যাবার পরোয়ানা বুঝি? তোমাকে নিতে এসেছে?"

অধ্যাপক মহলানবিশ তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন, "না, না, আমি শুধু আপনাকে একবার দেখতে এলাম। রানী এখন আপনার কাছে থাকবে; ওর ফিরে যাবার কিছু দরকার নেই।" খুব খুশি হয়ে আমার হাতখানা ধ'রে বললেন, "তবু ভালো; আমার কিরকম ভয় লাগে এই বুঝি পালাবে। গ্যাখো, তোমরা কাছে থাকো, একটু গল্পসল্প ক'রে খুশি থাকি। খাবার সময় বলো 'এটা খান ওটা খান, আহা! অতটুকু খেয়ে বাঁচবেন কেমন করে'—শুনতে কেমন মিষ্টি লাগে। তা না, এসেই কেবল যাই যাই।" উনি বললেন, "না, না, ও এখন যাবে না। সত্যি আমি ওকে নিতে আসিনি, শুধু আপনাকে দেখতে এসেছি।" "খবরটা তো ভাল শোনাচ্ছে। আচ্ছা, এইবারে তাহ'লে তুমি গাড়ির কাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে নাও গো। রানী, নাইবার ঘরে সব ঠিক আছে তো?" "হ্যাঁ, সব ঠিক আছে" ব'লে উনি নেবে গেলেন। কবি আমাকে বললেন, "তুমি হচ্ছ আমার সব শেষের বন্ধু। জানি, আর সকলে চ'লে গেলেও তুমি যাবে না।" সেদিনও জানি না যে আর মাত্র একমাস উনি আমাদের কাছে থাকবেন।

রাত্রে খাবার টেবিলে অনেক লোক। ইন্দিরা দেবীরা, আমরা, মীরাদি, মৈত্রেয়ী—টেবিল ভরা। খেতে ব'সে নানান রকম কথাবার্তার মাঝে ১৯২৮ সালে কবির সঙ্গে কুন্নুর ইত্যাদি যাওয়ার গল্প উঠল। সেবারে অনেক রকম মজার মজার ঘটনা ঘটেছিল—তার মধ্যে এণ্ড্রুজ সাহেবের পাগলামিও অনেক ছিল যা ব'লে অনেকবার অনেক লোককে আমরা হাসিয়েছি। সেদিনও অধ্যাপক সেইসব গল্প ব'লে সবাইকে খুব হাসালেন।

খাওয়ার শেষে মীরাদি বললেন, "প্রশান্ত আজ খুব হাসিয়েছে কিন্তু। ও যে আবার এত মজা ক'রে গল্প বলতে পারে তা জানতুম না।"

পরদিন সকালে কবির কাছে যখন গিয়েছি দেখি তার আগেই মীরাদি গিয়ে বসেছেন। কবি তাঁকে জিজ্ঞাসা করছেন, "কিরে! কাল রাত্তিরে তোদের খাওয়াটা কিরকম হল?" "কাল টেবিলে ভারি জমেছিল। প্রশান্ত সকলকে খুব হাসিয়েছে।" ব'লে মীরাদি আবার সেই সব কুন্নুরের গল্প করাতে কবির পুরনো কথা মনে প'ড়ে যাওয়ায় তিনিও খুব আমোদ অনুভব করলেন। আমি যেতেই বললেন, "রানী, মীরুর কাছে শুনলুম কাল রাত্রে নাকি আমাদের স্ট্যাটিস্‌টিশিয়ান্‌ সকলকে খুব হাসিয়েছে টেবিলে? এটা তো একটা নতুন খবর। ও আবার লোককে হাসাতে জানে? আমাদের তো ধারণা যে সাংখ্যিক কেবলি অঙ্ক কষে, আর তুমি লোককে হাসাও আর হাসো। কিন্তু মীরুর কাছে যা শুনলুম তাতে বুঝছি যে ও অত গম্ভীর নয়; মাঝে মাঝে আমাদের মতো হাসিঠাট্টাও করতে পারে।" আমি বললাম, "এণ্ড্রুজ সাহেবের সেবারকার কাণ্ড বললে কে না হাসবে? সত্যি কী পাগলই ছিলেন।" কবি বললেন, "ও আমার একটা অদ্ভুত মানুষ ছিল।" ব'লেই খিলখিল ক'রে হেসে উঠলেন। "সত্যি, সব মনে প'ড়ে গেল। কী কাণ্ডই করল মাঝরাত্রে ঘরে ঢুকে। আমি যত বলি ওরা ঘুমুচ্ছে, ওদের ওটা বেড্‌রুম্‌, ঢুকো না, তুমি ইংরেজ হয়েও এটুকু এটিকেট্‌ জানো না?—কে কার কথা শোনে। ঝড়ের মতো ঢুকে পড়ল।" আমরা দুজনেই খুব হাসতে লাগলাম। তারপরে বললাম,

"সেইবারেই তো 'শেষের কবিতা' আপনি লিখলেন। কী জোর ক'রেই না আপনাকে সেদিন লিখতে বসিয়েছিলাম।" বললেন, "ছ্যাখো, তুমি সব লিখে রাখো সেবারকার বেড়াবার গল্প। কিছু বাদ দিও না। তোমার খুব স্পষ্ট মনে থাকে, ছোট-খাটো খুঁটি-নাটি সব কথা; আমি সহজেই ভুলে যাই। আজ তোমাদের মুখে শুনে আবার সব মনে পড়ছে। তুমি এখনি লিখতে আরম্ভ কর, নয় তো পরে ভুলে যাবে। কিচ্ছু বাদ দিও না, যা যা মনে আছে সব লিখো।" আমি বললাম, "অত ডিটেল্-এ লিখলে যে অনেক অবান্তর জিনিসও লেখার মধ্যে এসে যাবে।" কবি বললেন, "তা হোক্, তাতে খারাপ হবে না। পড়তে ভালোই লাগবে। একটা ইতিহাস থেকে যাবে যে 'শেষের কবিতা'টা কিরকম ক'রে লিখেছিলুম। সব মজার মজার কীর্তিও থেকে যাবে—লোকের পড়তে ভালোই লাগবে। আমি বলছি তুমি কিছু বাদ দিও না।"

আমি বললাম, "আমার যে কখনো কিছু লেখা অভ্যাস নেই, কাজেই আমার কিছু লিখতে ভয় হয়।" "কেন, তুমি চিঠি তো খুব গড়গড় ক'রে লিখতে পারো। ওরকম গল্পের চিঠি পড়তে ভালোই লাগে; তেমনি ক'রেই বেড়াবার গল্পটা লিখবে। চিঠির মতোই লেখো। এক কাজ করতে পারো, আমাকেই না হয় একখানা চিঠি লেখো সেবারকার সব বেড়াবার গল্প ব'লে।"

ইতিমধ্যে আমার স্বামী উপরে এলেন। "কি হে প্রশান্ত, কাল শুনলুম খুব তোমাদের জমেছিল টেবিলে। রানীকে এইমাত্র বলছিলুম সব এখনি লিখে রাখতে। নইলে পরে ঝাপসা হয়ে যাবে।" উনি বললেন, "হ্যাঁ, ওর খুব মনে থাকে,

কাজেই লিখে রাখা নিশ্চয়ই উচিত। আমিতো কত বলি, ও শোনে না।" কবি বললেন, "বাবা! সেই কুন্নুরে রাজবাড়ির খাওয়া—মনে আছে সে কী কাণ্ড? আমার তো এমন হল যে খাবার দেখলেই গা কেমন করত। বেশ ছিলুম ঠাণ্ডাতে—'শেষের কবিতা'টা শুরু করেছি, আরো কিছুদিন অনায়াসে থাকতে পারা যেত। তা না, খাইয়ে তাড়িয়ে দিলে গো। একেই বলে রাজকীয় বদান্যতা।"

এমনি ক'রে 'শেষের কবিতা'র আলোচনা হ'তে হ'তে আমার স্বামী 'লিপিকা'র কথা তুললেন। "মনে আছে আপনার সেই 'লিপিকা'র সময়কার কথা? তার আগে শরীর খুব খারাপ। জালিয়ানওয়ালাবাগের ব্যাপার নিয়ে খুব কষ্ট পাচ্ছেন। আমি একদিন পেনেটির বাগানে নিয়ে গেলাম। সেখানেও ভালো লাগল না। ক'দিন কিরকম ক'রে কাটল। তারপর যেদিন নাইট্‌হুড্ ছাড়ার চিঠি পাঠিয়ে দিলেন সেইদিন থেকে নিশ্চিন্ত। সকালবেলা আমি চিঠিখানা নিয়ে গেলাম, আর বিকেলে দেখি আপনি তেতলার ঘরে চ'লে গিয়েছেন। ঘরে ঢুকতেই একখানা ছোট্টো খাতা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এই নাও আর একটা লেখা'। দেখি—'বাপ শ্মশান হতে ফিরে এসেছে' ঐটে লিখেছেন। এইটাই 'লিপিকা'র প্রথম লেখা, তারপর ক'দিনের মধ্যেই হুড়মুড় ক'রে সমস্ত বইখানা লেখা হয়ে গেলো। তারপরে একবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে একদিন সারারাত জেগে আপনার খাতাখানা থেকে প্রায় সমস্তটাই আমি কপি ক'রে নিয়ে এসেছিলাম।" "ছাখো প্রশান্ত, তুমিও এটা লিখে রাখো। সেই জালিয়ানওয়ালার ব্যাপারের সময়

এক তুমিই আমার কাছে ছিলে। এই যা সব বললে আমার বেশ মনে পড়ছে—এসব কথা আর কারো জানা নেই। আমারও সব কথা মনে ছিল না; এখন তোমার কাছে শুনতে শুনতে সমস্তটা পরিষ্কার মনে পড়ছে। সেই চিত্ত-র বাড়ি যাওয়া, তার সঙ্গে কী কী কথাবার্তা হল, সাহেবকে মহাত্মাজীর কাছে পাঠানো, তাঁর সেই সময়কার মনোভাব—এসমস্তই খুব important ইতিহাস হে। এগুলো হারিয়ে যাওয়া উচিত নয়। তুমি এখনি লিখে ফেল।”

অধ্যাপক তখনি নিচে চ'লে গিয়ে সমস্ত ঘটনাটা লিখে নিয়ে এসে কবিকে প'ড়ে শোনালেন। কবি খুব মন দিয়ে শুনে শেষ হলে বললেন, “ঠিক হয়েছে হে, খুব ভালো লেখা হয়েছে।” “কিন্তু আপনাকে এই দুটো পাতায় সই ক'রে দিতে হবে, যাতে প্রমাণ থাকে যে ঘটনাগুলো সত্যিই ঘটেছিল। নইলে দেশবন্ধু ও মহাত্মাজীর কথা নিয়ে একটা বাদানুবাদের সৃষ্টি হতে পারে। লোকে বলতে পারে আমি বানিয়ে লিখেছি।” কবি হেসে বললেন, “ঠিক বলেছ। এসব গোলমেলে কথা—নিয়ে এসো তাহলে কলমটা, সই ক'রে দিই। এ তো একেবারে সত্য ঘটনা! আমার পরিষ্কার মনে পড়ছে কী কী কথা হয়েছিল। তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না এসব কথা।” ব'লে সই ক'রে নিচে তারিখ দিয়ে দিলেন। হয়ে গেলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “কর্তা কিরকম সাবধানী দেখেছ? দলিল পাকা ক'রে নিল, যাকে বলে ডকুমেণ্ট।” বলবার ধরন ও চোখমুখের মজার ভাব দেখে আমরা হোহো ক'রে হেসে উঠলাম। “বেশ মনে আছে দিনের পর দিন ‘লিপিকা’ লিখেছি; কোথায় গেছে

জালিয়ানওয়ালাবাগ, কোথায় গেছে পলিটিক্স্‌; আমার আর কিছুই মনে নেই, সারারাত কেবল লেখার মধ্যেই ডুবে রয়েছি। ভাষা কী? একেবারে নতুন রূপ নিয়েছে। আশ্চর্য! কোথা থেকে এল ওরকম ভাষা? আমি অনেকবার দেখেছি কোনো কিছু একটা নিয়ে মনটা বড় বেশি নাড়া খেলেই তারপর আমার লেখা বেরোয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কিছু না একটা করতে পারি ততক্ষণ কষ্ট পাই। তারপর নিজের কর্তব্য চুকিয়ে দিলেই ব্যাস্‌; একেবারে লেখার মধ্যে দৌড় দেয় মন। তখন মর্মান্তিক দুঃখের কারণগুলোও একেবারে মরীচিকা হয়ে মিলিয়ে যায়। এইটেই আমার পালাবার রাস্তা। প্রশান্ত আবার সেই 'লিপিকা'র খাতাখানা একবার বোলপুর এসে সারারাত জেগে ব'সে একরাত্রের মধ্যে কপি ক'রে নিল। আমি যা যা কাটাকুটি করেছিলুম ও তাও সমস্ত খুঁটিয়ে উদ্ধার ক'রে নিয়েছে। পরে সব গবেষণা করবে, প্রথমে যেটা লিখেছিলুম সেই কথাটাই ভালো ছিল না শেষে যেটা বসিয়েছি সেইটাই ভালো; এই সব কত কী! সায়েন্টিস্ট কি না। একেই বলে তথ্য সংগ্রহ করা।"

কবির ঘরে শ্রীমতী রানী চন্দ এবং আরো কেউ কেউ বসেছিলেন। ওঁর লেখাটা চেয়ে নিয়ে তাঁরা পড়লেন। নিচে গেলে ইন্দিরা দেবী ও প্রমথবাবুরাও পড়লেন এবং সকলেরই খুব পছন্দ হল। কারণ সেই সময়কার ক'দিনের ইতিহাস একেবারে খুঁটিয়ে বলা—অনেকেই কবির সেই সময়কার মনের অবস্থা জানতেন না। এটাতে একেবারে পরিষ্কার একটা ছবি পাওয়া গেল।

এমনি ক'রে কবির তাগিদেই প্রথম কলম ধরেছি। খুব ইচ্ছে ছিল লেখাটা শেষ ক'রে তাঁর হাতে দেব। বিধাতার বিধানে তা আর হল না। সেই সময় তাঁর ঘরে ব'সে ব'সেই এটা লিখেছিলাম। তাঁর চেয়ারের পিছনে ব'সে লিখতাম, যাতে দেখতে না পান, কারণ কাজ করছি দেখলে হয়তো তাঁর নিজের কোনো কাজের ফরমাশ করতে ইতস্ততঃ করবেন। হঠাৎ দুই একদিন প্রশ্ন করেছেন, "তোমার লেখা আরম্ভ করেছ?" "হ্যাঁ, লিখছি।" "ভালো ক'রে খুঁটিয়ে লিখো কিন্তু। কিছু বাদ দিও না। এণ্ড্রুজ, আমার পাগ্‌লা। কী ভালোই বাসতো আমাকে। ওর একটা মজার ইতিহাস থেকে যাবে আমার 'শেষের কবিতা'র ইতিহাসের সঙ্গে।"

কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে

১৯২৮ সালের মে মাসের প্রায় মাঝামাঝি। তার কয়েক-দিন আগেই বিশ্বভারতীর তরফ থেকে খুব ঘটা ক'রে রবীন্দ্র-নাথের জন্মোৎসব করা হয়েছে জোড়াসাঁকোতে। সেইবার ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী দিয়ে তুলাদান করা হল বেশ মনে আছে লালবাড়ির (বিচিত্রা ভবন) দক্ষিণের বারান্দায় প্রকাণ্ড একটা তুলাদণ্ডের উপর একদিকে ব'সে কবি, আর অন্যদিকে রাশ-করা ওঁর গ্রন্থাবলী। সেইসব বই পরে রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে নানা লাইব্রেরিতে দান করা হল।

সেইবারই অল্প কয়েকদিন আগে "একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি", "মরি হায় চলে যায় বসন্তেরি দিন", "হে মাধবী দ্বিধা কেন" প্রভৃতি গানগুলি রচনা করেছিলেন, আর ২৫শে বৈশাখ অনেকে মিলে সেই সব নতুন গান আমরা গেয়েছিলাম। কবি নিজেই এইসব টাটকা লেখা গান আমাদের শিখিয়েছিলেন। প্রতিদিন দুটো তিনটে ক'রে গান অমিতাকে (অমিতা ঠাকুর), আমাকে ও আরো অনেককে যাদের হাতের কাছে পাচ্ছেন তাড়াতাড়ি শিখিয়ে দিচ্ছেন, পাছে দেরি হ'লে নিজে ভুলে যান।

গানের কথা বলতে গিয়ে একটা মজার কথা মনে পড়ল। যেদিন সন্ধ্যেবেলা "হে মাধবী দ্বিধা কেন" শেখাচ্ছিলেন সেদিন হঠাৎ গানের মাঝখানে দেখি কবির পুরাতন ভৃত্য বনমালী কবির জন্যে এক প্লেট আইস্ক্রীম্ নিয়ে ঘরে ঢুকবে

কিনা ইতস্ততঃ করছে। একবার চৌকাঠের ভিতরে পা দিয়ে উঁকি মেরেই পরক্ষণে পা টেনে নিয়ে বারান্দায় ফিরে যাচ্ছে। বারকতক এই রকম করবার পর হঠাৎ কবির নজরে পড়বামাত্র তিনি বনমালীর দিকে ফিরে হাত নেড়ে গেয়ে উঠলেন, "হে মাধবী দ্বিধা কেন? ভীরু মাধবী তোমার দ্বিধা কেন? আসিবে কি ফিরিবে কি দ্বিধা কেন?" বনমালী তো ততক্ষণে দে ছুট। আমি আর অমিতা হো হো ক'রে হেসে উঠলাম, কবিরও হাসি থামে না। হাসতে হাসতে বললেন, "আমার লীলমণিকে (বনমালীর উচ্চারণের নকল ক'রে অনেক সময়েই ওকে 'নীলমণি'র জায়গায় 'লীলমণি' বলা ওঁর অভ্যাস ছিল) যদিও কবিত্ব ক'রেও 'মাধবী' বলা চলে না, তবু বাঁদরটার দ্বিধাটা ঠিক মাধবীরই মতো। দেখছি ওর একটা নাম বাড়ল। আরে! আইস্‌ক্রীম্ খাওয়াবি তাতে এত ভয় কিসের? এলেই তো হয় ঘরের মধ্যে।"

সেদিন আর ও-গানটা আমাদের শেখা হল না। যতবারই আমরা "হে মাধবী, ভীরু মাধবী দ্বিধা কেন" সুর ক'রে গাইতে যাই ততবারই তিনজনে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠি। কবি শেষে বললেন, "থাক্, ওটা আজ আর হবে না। বুঝতে পারছি ভবিষ্যতেও তোদের পক্ষে ওটা গম্ভীরভাবে গাওয়া শক্ত হবে।" ব'লে অমিতার দিকে ফিরে হাসতে লাগলেন। সেদিনকার সন্ধ্যায় আমাদের গান শেখা বাদ পড়ল।

দিনুবাবু অনেক সময় অনুযোগ ক'রে বলতেন, "রবিদা, তুমি একই গান দু-তিন রকম সুরে শেখাও। ভুল ধরলে লোকে বলে স্বয়ং কবির কাছে শিখেছি।" উনি হেসে উত্তর দিতেন, "জানিস ওরা হয়তো নিজেরাই ভুলে গিয়ে অন্য সুরে

গায়, আর আমার 'পরে দোষ চাপায়। নিজের স্মৃতিশক্তির ওপর একটুও বিশ্বাস নেই ব'লে আমিও প্রতিবাদ করতে সাহস পাইনে। আর তাছাড়া আমার নিজেরই তো দেওয়া সুর, কাজেই আর একটা নতুন সুর দিলুমই বা। এক তুই ছাড়া তো আর কেউ কৈফিয়ত তলব করবে না।" এর পরে দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠতেন—ভুল সুরের ঝগড়া থেমে যেত।

কবি অনেক বার দিনুবাবুর সামনেই বলেছেন, "নতুন গান সম্বন্ধে হলফ ক'রে কিছু বলতে পারিনে কারণ আজ শিখিয়ে কাল ভুলে যাই। তারপর তোমরা কেউ গাও, হঠাৎ মনে হয়, বাঃ, লোকটা বেশ গান লিখেছিল তো! কিন্তু মজা হচ্ছে যে, আমার কম বয়সে লেখা গানগুলোর সুর আমি ভুলিনি—সবগুলো গানের কথা ও সুর আমার স্পষ্ট মনে আছে। তাই দিনুবাবুর সঙ্গে সেসব গান নিয়ে যদি ঝুটোপুটি বাধে তো আমি কিছুতেই ওঁর কাছে হার মানিনে—বলি, 'তুই বিবিকে (ইন্দিরা দেবী) জিজ্ঞাসা করিস—ঐ হল আমার আর-এক অথরিটি—দেখবি আমার উপর অবিচার করছিস।' 'দিন্‌দা' যতই হাসুন উনিও আজকাল আমার মতো একটু একটু ভুলতে শুরু করেছেন। তবে ওঁর হাতে অস্ত্র আছে, উনি 'স্বরলিপি'তে নিজের ভুলটাকে পাকা ক'রে ফেলেন, তখন দশজনের কাছে আমাকেই চুপ ক'রে যেতে হয়। ঐ 'শ্রাবণ বরিষন পার হয়ে কী বাণী' গানটা স্পষ্ট মনে আছে বেহাগে সুর বসিয়েছি, আর শুনি মেয়েরা গাইছে মল্লারে। আমি আপত্তি করাতে বলল—'বাঃ, পরশু দিন দিন্‌দার গানের ক্লাসে শিখেছি। দিন্‌দা ভুল সুর শিখিয়েচেন

এ হতেই পারে না; আপনি ভুলে গেছেন।' হায়রে আমার শনিগ্রহ! গানে যে-হতভাগ্য সুর বসিয়েছে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু ওরা কিছুতেই সে আপত্তি মানলে না, কারণ 'দিন্‌দা'র কাছে যে শিখেছে। আমার কবির খেয়ালের চেয়ে 'দিন্‌দা'র উপর অনেক বেশি ভরসা। আরে! একথা ভুললে চলবে কেন যে, 'দিন্‌দা'ও কবি কম নয়। তবু যত অবিশ্বাস আমারই 'পরে? আসলে দিনু অনেক দিন ধ'রে নিজের একটা রেপুটেশ্যন্ খাড়া ক'রে নিয়েছে, কাজেই এখন আর ওর ভয় নেই। আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমাতে ও জিতবেই জিতবে; অতএব কী হবে ঝগড়া ক'রে?" এইসব কথাতে দিনুবাবুর সে কী প্রাণখোলা হাসি।

সেইসব হাসিঠাট্টার দিনগুলো এখন যেন রঙীন স্বপ্নের মতো মনে হয়। দিনেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের হাসিঠাট্টা, উত্তর-প্রত্যুত্তর যাদের শোনবার সৌভাগ্য ঘটেছিল, চিরদিনের মতো তাদের মনের মণিকোঠায় তা সঞ্চিত হয়ে রইল।

যে কথাটা গোড়ায় বলতে শুরু করেছিলাম: ১৯২৮ সালের গ্রীষ্মকালে রথীবাবু খুব অসুস্থ, কবিরও শরীর ভালো নয়; স্থির হল ওঁরা সবাই সেবারে বিলেতে যাবেন। জাহাজের তখনও মাসখানেক দেরি। তাই প্রতিমাদি'রা ক'লকাতায় অপেক্ষা না ক'রে কোডাইকানালে চ'লে গেছেন, যাতে কবি ক'লকাতা থেকে জাহাজে রওনা হ'লে ওঁরা মাদ্রাজ অথবা কলম্বোতে এসে ওঁর সঙ্গে মিলতে পারেন।

কবির যাওয়ার সমস্ত ঠিক—পরদিন খিদিরপুর ডক থেকে জাহাজ ছাড়বে। জিনিসপত্র গোছানো শেষ হয়েছে। সুরেনবাবু (সুরেন কর), মিঃ আরিয়াম্ (অধুনা শ্রীআর্য্য-

নায়কম্) ও এণ্ড্রুজ সাহেব রয়েছেন জোড়াসাঁকোতে কবির সঙ্গী। মিঃ আরিয়াম্ ও এণ্ড্রুজ সাহেব কবির সঙ্গে বিলেত যাচ্ছেন, আর সুরেনবাবু এসেছেন গোছগাছ ক'রে ওঁকে রওনা ক'রে দিতে।

এণ্ড্রুজ সাহেব জাহাজ ঠিক ক'রে এসে বললেন, "গুরুদেবের এ-স্টীমারে যেতে কিছু কষ্ট হবে না, আরামেই যাবেন। ঘরটা ভালো পাওয়া গেছে।"

কবির অভ্যাসের সঙ্গে যাদের কিছু পরিচয় ছিল তারা সকলেই জানত ঠিক শোবার ঘরের সংলগ্ন স্নানের ঘর না থাকলে ওঁর কিরকম অসুবিধা হয়। এণ্ড্রুজ সাহেবের এসব বিষয়ে যে কোনো খেয়াল নেই তাও সকলেই জানে। কাজেই আমরা সবাই মিলে সাহেবকে প্রশ্ন করতে লাগলাম যে কবি আলাদা একটা স্নানের ঘর নিজের জন্যে পাবেন কিনা। সাহেব ঠিকমতো জবাব দিতে পারলেন না। সুরেনবাবুর রাত্রেই জিনিসপত্র জাহাজে তুলে দিয়ে আসবার কথা। আমার স্বামী পরামর্শ দিলেন যে জিনিস নিয়ে যাবার আগে নিজের চোখে একবার দেখে আসা ভালো কিরকম কী ব্যবস্থা। নইলে শুধু এণ্ড্রুজ সাহেবের উপর নির্ভর ক'রে শেষে মুশকিল হতে পারে। সুরেনবাবু খিদিরপুর চ'লে গেলেন সরজমিন তদন্ত করতে।

আমরা সবাই তখনও জোড়াসাঁকোতে ব'সে আছি; রাত প্রায় সাড়ে ন'টা হবে। সুরেনবাবু ফিরে এসে বললেন, "এ জাহাজে গুরুদেবের যাওয়া অসম্ভব। উনি যে তলায় থাকবেন তার নিচের তলায় স্নানের ঘর—প্রত্যেকবার ওঁকে সিঁড়ি ভেঙে যেতে হবে।" কবির অন্তিমকালের অসুখের সূচনা

তখন থেকেই শুরু হয়েছে, শরীরও বেশ অসুস্থ, কাজেই দূরে স্নানের ঘর হ'লে ওঁর পক্ষে অসম্ভব।

কবি সব শুনে বললেন, "ঐ জাহাজে এণ্ড্রুজ ও আরিয়াম্ সব জিনিসপত্র নিয়ে চ'লে যান, আমি দুদিন পরে ট্রেনে ক'রে গেলেও ওঁদের সঙ্গে সঙ্গেই মাদ্রাজ পৌঁছতে পারব।" কবির কথামতো ওঁরা দুজন চ'লে গেলেন।

পরদিন সকালে যখন জোড়াসাঁকোতে গিয়েছি কবি বললেন, "রানী, চলো তোমরা দুজনে আমাকে মাদ্রাজ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে। বহুদিন তো পথে পথে দুজনে আমার অভিভাবকের কাজ করেছ, আর একবারও না হয় করবে।"

প্রেসিডেন্সী কলেজের তখন গ্রীষ্মের ছুটি, কাজেই আমাদের সেইদিনই মাদ্রাজ মেলে কবির সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে কোনো বাধা হল না। আমরা ঠিক করলাম কবিকে একসপ্তাহ পরে মাদ্রাজ থেকে বিলেতের জাহাজে তুলে দিয়ে সারা ছুটিটা দক্ষিণ দেশেই বেড়িয়ে বেড়াব।

অসহ্য গরমের মধ্যে তিনজনে যাত্রা করা গেল। মাদ্রাজে পৌঁছে দেখি আরিয়াম্ ও এণ্ড্রুজ দুজনেই স্টেশনে হাজির। শুনলাম মিসেস্ বেসাণ্ট আডিয়ারে থাকবার জন্যে কবিকে নিমন্ত্রণ করেছেন; তাই আমরা সকলে সেখানে গিয়েই উঠলাম।

'ব্ল্যাভাট্স্কি হাউস' মস্ত বাড়ি। দোতলায় কবি ও আমাদের দুজনের জায়গা, ও একতলায় সাহেবের স্থান হল। আরিয়াম্ বোধ হয় আর কোনো একটা জায়গায় ছিলেন—ঠিক মনে নেই।

মিসেস্ বেসাণ্টের আতিথ্যে আয়োজনের কোনো অভাব

ছিল না, অভাব শুধু বিজ্‌লী পাখার। অথচ মাদ্রাজে গ্রীষ্মকালে ঐ জিনিসটির অভাব ঘটলে কী শোচনীয় অবস্থা হয় তা অনুমান করা শক্ত। ওদেশে অনেকের একটা মজার ধারণা আছে যে, পাখার বাতাসে নিউমোনিয়া হবার ভয়, তাই বোধ হয় অতিথ্‌শালায় এই সতর্কতা। যাই হোক, কবির কষ্ট দেখে এণ্ড্রুজ সাহেব কোথা থেকে ছোট্টো একটা টেব্‌ল্ ফ্যান্ জোগাড় ক'রে আনলেন।

বাড়িটার সামনে চওড়া বারান্দা, আর তার সামনেই দূরে নীল সমুদ্র—ঢেউয়ের পর ঢেউ আছড়ে পড়ছে। সেই চওড়া বারান্দাতেই সারাদিন আমাদের শোওয়া বসা খাওয়ার ব্যবস্থা হল। গরমে ঘরে ঢোকে সাধ্য কার?

বারান্দায় রাত্রে পর পর তিনখানা খাট পড়ল। কবির খাটের পাশে সেই ছোট্টো পাখাটাকে এমন হিসেব ক'রে রাখা হল যাতে ওঁর খাট ছাড়াও আরো দুখানা খাটে কিছু কিছু হাওয়া লাগে।

বরাবর দেখেছি কাছে যে কেউ থাকত তার সুবিধার জন্যেই কবি ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। মাদ্রাজ মেলে যাবার সময় গরমের মধ্যে বারবার বলেছেন, "রানী, তোমাদের দিকে পাখাটা ভালো ক'রে ঘুরিয়ে নাও; কিছু অসুবিধা হবে না আমার। আমি জানি যে বৈজ্ঞানিকের পাখা না হ'লে কষ্ট হয়। আমার শান্তিনিকেতনে থেকে গরম সহ্য করা অভ্যাস আছে।" মাদ্রাজে তাই ছোট্টো পাখাটা যখন এল তখনও ওঁর বিছানার কাছে সেটা রাখতে মহা আপত্তি। শেষকালে আমার স্বামী বললেন, "আমাকে তো ম্যাথমেটিশিয়ান্ বলেন? দেখুন, আমি হিসেব ক'রে এমন অ্যাংগেলে রাখবো

পাখাটা যে, তিনজনেই ঠিক বাতাস পাবো।" নানারকম হিসেব ক'রে খাট তিনখানা যখন সাজানো হল আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে কবি হেসে বললেন, "একেই বলে সায়েন্টিস্ট।"

আমরা পৌঁছবার পরে সন্ধ্যেবেলা বাগানের মধ্যে প্রকাণ্ড গাছতলায় আশ্রমের সমস্ত অধিবাসীদের নিয়ে মিসেস্ বেসাণ্ট কবির সম্বর্ধনা করলেন। মিসেস্ বেসাণ্টের সেদিনকার বক্তৃতা কবিকে খুব স্পর্শ করেছিল। অত অসুস্থ শরীর নিয়েও তাই ধন্যবাদ দিতে উঠে যা বললেন সে পুরো বক্তৃতার চেয়ে কম নয়। আশ্রমবাসী সকলেরই মন মুগ্ধ হল।

অত অসুস্থ শরীর, তার উপর অসহ্য মাদ্রাজী গরম; না হ'লে কবি আডিয়ারে বেশ আনন্দেই থাকতেন। কারণ বাড়িটার কথা তো আগেই বলেছি—চমৎকার প্রকাণ্ড চওড়া বারান্দায় ব'সে দিনরাত সমুদ্র দেখা যায়, বড় বড় গাছের ঘন ছায়ায় ঘেরা বাগান, ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত অসংখ্য রকম পাখির ডাক, নির্জন শান্তিতে ভরা চারিদিক—এইরকম পরিবেশের জন্যেই তো চিরদিন ওঁর মন ব্যাকুল হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মাদ্রাজে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। স্থানীয় একজন ডাক্তারকে দিয়ে তখন কবির চিকিৎসাও চলছে ultra-violet আলোর। প্রতিদিন আলো নেবার ফলে বিশেষ যে কিছু উন্নতি হয়েছিল তা মনে হয় না, তবে বোধহয় পায়ের ফোলাটা সামান্য একটু কমেছিল—অন্তত ডাক্তার তাই মনে করেছিলেন।

সেইবারই আডিয়ারে তিনটি মেয়ে একদিন কবির সঙ্গে দেখা করতে এল—এরা তিন বোন। কাশীতে থিওসফিক্যাল সোসাইটির মেয়েদের ইস্কুলের ছাত্রী। এদের মধ্যে কেউ গান

জানে কিনা জিজ্ঞাসা করায় একটি মেয়ে কবিকে গান শোনাল। তার গান শুনে কবি মুগ্ধ। উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বৃত্তি দিয়ে তাকে নিয়ে গেলে সে শান্তিনিকেতন যেতে রাজী আছে কিনা। সে তো আকাশের চাঁদ হাতে পেল, কারণ শান্তিনিকেতন যাবার ইচ্ছা নিয়েই কবির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল এবং এই অর্থের অনটনই তার প্রধান অন্তরায়। এই মেয়েটি শান্তিনিকেতনে আসার অল্পদিনের মধ্যেই এমন চমৎকার বাংলা শিখল, যে ওর মুখে কবির গান শুনে কেউ ধরতে পারল না যে, সে বাঙালী নয়। সেইবার বর্ষামঙ্গল উৎসবে এম্পায়ার থিয়েটারে সাবিত্রী যখন "তুমি কিছু দিয়ে যাও", "শুভ্র প্রভাতে" প্রভৃতি গানগুলি একা গাইল—সকলে স্তম্ভিত। মাদ্রাজী মেয়ের মুখে এমন স্পষ্ট বাংলা গান তো কেউ শোনেনি। গানের কথা ও সুর যেমন অপূর্ব, সাবিত্রীর গলাও তেমনি অসাধারণ। তখনকার দিনে মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা থাকত না—যারা গাইত তাদের নিজেদের গলাই ছিল সম্বল। সাবিত্রীর ভগবান-দত্ত গলা দীনেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষায় যে কী অপূর্ব সঙ্গীত সৃষ্টি করেছিল—তা যারা শুনেছে তারাই মনে রাখবে।

একসপ্তাহ দুঃখ ভোগের পর যখন গরম অসহ্য বোধ হচ্ছে তখন হঠাৎ একদিন সকালে সাহেব খুব উৎসাহিতভাবে একখানা টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে কবির কাছে এসে হাজির—"Gurudev, here is a telegram from the Maharaja of Pithapuram. He has gone up to Coonoor and invites you to go there to spend a few days with him before you leave for Europe."

অপ্রত্যাশিত এই খবর! গরমের হাত থেকে কয়েক-দিনের জন্যেও অন্তত মুক্তিলাভ হবে মনে ক'রে আমরা সকলেই খুব খুশি—কবি পিঠাপুরমের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

সেইদিনই রাত্রের গাড়িতে কুন্নুর যাওয়া হবে। আমি সব জিনিসপত্র তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিচ্ছি, এমন সময় সাহেব এসে বললেন, "রানী, নিতান্ত দরকারী জিনিস ছাড়া আর কিচ্ছু নেবে না। দশদিন পরেই বোধহয় আমাদের জাহাজ পাওয়া যাবে, কাজেই পাহাড়ে খুব বেশিদিনের জন্যে যাওয়া নয়।" যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘুরেছেন তাঁরা জানেন যে, কোথাও যাবার সময় কবির জিনিসের মধ্যে বাছাই করা কত শক্ত। আজ যেটা অদরকারী কাল সেটা না হ'লে নয়। বিশেষ ক'রে শরীর যখন খারাপ তখন ভয়ে ভয়ে আরো অনেক জিনিস বেশি নিতে হয়—বলা তো যায় না কখন কোন্‌টা হঠাৎ দরকার হবে? বনমালী যেমন সর্বদা বলত, "যেবারে যে-জিনিসটি ফেলে আসব ঠিক সেইবারেই বাবামশায় সেই জিনিসটি চেয়ে বসবেন; কিন্তু কতবার হয়তো সেই জিনিসটি সঙ্গে নিয়ে ঘুরেছি, কখনো সে-সময় দরকার হয়নি। তাই তো বাবামশায় রাগ করলেও আমি যতটা পারি বাক্সে ভ'রে নিই। বাবামশায় বলেন, 'আঃ, তুই বড় বোঝা বাড়াস।' কিন্তু বোঝা তো বাবামশায় নেবেন না, নেবে তো কুলিগুলো।" আমারও বনমালীর সঙ্গে মতের মিল ছিল। কাজেই আমি মিঃ এণ্ড্রুজের কথায় কান না দিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কবির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আলাদা করছি; বিছানাগুলো গোছ করা দেখে সাহেব অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, "আর যাই নাও, বিছানা নেবার

দরকার নেই। কারণ গুরুদেবের জন্যে মহারাজা আলাদা একটা বাড়ির ব্যবস্থা করেছেন আর বিছানা দেবেন না এ কখনো হতে পারে ?" আমি তো অবাক। বিছানা না নিয়ে পাহাড়ে যাব ? সেখানে বিছানা না পেলে সেই শীতের মধ্যে কী উপায় হবে ? যথেষ্ট গরম কাপড়ের অভাবে ঠাণ্ডা লেগে গেলে তার দায়িত্ব নেবে কে ? আর মহারাজা বিছানা দিলেও কবির নিজের বালিশ, গায়ের কাপড় না হ'লে তো অসুবিধা হবে। বহুদিন ওঁর সঙ্গে ঘুরেছি, কাজেই হাতের পাঁচ যে সর্বদা হাতে রাখা উচিত এ জ্ঞান যথেষ্ট হয়েছে। তাই বলতে হল, "গুরুদেবের বিছানা না নিয়ে আমি বাড়ি থেকে কিছুতেই বেরোব না।" সাহেব আমার উপরে বেজায় চ'টে গেলেন। বরাবরই ওঁর কাছে যথেষ্ট স্নেহ পেয়েছি, কিন্তু এবার ওঁকে সত্যিই রাগিয়ে দিলাম। বললেন, "তুমি কি মনে করো আমার চেয়ে তোমার বুদ্ধি বেশি ? আমি যখন বলছি বিছানা দরকার হবে না তখন তোমার এটা বিশ্বাস না করবার কী কারণ আছে ?" আমি উত্তর করলাম, "গুরুদেবের সঙ্গে যতদিন ঘুরেছি কোনোরকমেই যাতে ওঁর অসুবিধা না হয় সেজন্যে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। জেনে-শুনে কোনো জিনিস পথের মধ্যে ফেলে দিইনি যা ওঁর কাজে লাগতে পারে। ক'লকাতা থেকে এতদূর বিছানাটা টেনে এনে ঠিক পাহাড়ে যাবার মুখেই এটা ফেলে যাব ? কবির এই অসুস্থ শরীর, তার উপর ঠাণ্ডা লাগার ভয় নেই ? মহারাজা যদি বিছানা দেন তাহ'লে না হয় এটা খোলাই হবে না, কিন্তু সঙ্গে রাখতে দোষ কি ?" এণ্ড্রুজ সাহেব তবুও যখন আপত্তি করতে লাগলেন, তখন বাধ্য হয়ে বললাম, "মিথ্যে আমার

উপর জোর করছেন। আপনি যদি বেশি গোলমাল করেন তাহ'লে কিন্তু আমি যাব না আপনাদের সঙ্গে —আপনিই সব দায়িত্ব নিয়ে বিছানা ফেলে রেখে গুরুদেবকে পাহাড়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আসুন; আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমাকে সঙ্গে নিতে হ'লে গুরুদেবের জিনিসপত্র সম্বন্ধে আমার বিবেচনার উপর নির্ভর করতে হবে—এতে আপনি রাগই করুন আর যাই করুন!"

শেষকালে নিরুপায় হয়ে সাহেব আমার সঙ্গে একটা রফা করলেন, কিন্তু বারবার বলতে লাগলেন, "Rani, you are awfully obstinate."

যাই হোক, ব্যবস্থা হল যে শুধু কবির বিছানা, তাও নিতান্ত যা না হ'লে নয়, তাই যাবে সঙ্গে; কিন্তু আমাদের আর কারো বিছানা কিছুতেই যেতে পারবে না। নিজেদের জন্যে এত ভাবিনে, কাজেই অশান্তি এড়াবার খাতিরে এই প্রস্তাবে রাজী হতেই হল। তবুও লুকিয়ে কবির হোল্ড-অল্-এর মধ্যে আমাদের দুখানা কম্বল ও দুখানা সুজনি বেঁধে নিলাম। গাড়িতে ব্যবহারের জন্যে দুটো চামড়ার বালিশ ছিল, সেটা নিয়ে আর সাহেব কিছু আপত্তি করতে পারলেন না।

সাহেব তো আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বিছানার ভার লাঘব করালেন, কিন্তু সেই খালি হোল্ড-অল্-এর মধ্যে অধ্যাপক যখন তাঁর খান কুড়ি মোটা মোটা ভারি ভারি বই, দশবারো খানা বাঁধানো "বায়োমেট্রিকা" আর তাড়া তাড়া রাশিবিজ্ঞানের খাতাপত্র ভরতে লাগলেন তখন তিনি একটি কথাও বললেন না। সেই পর্বত-প্রমাণ বই ও কাগজের

বোঝা আমার লেপের চেয়ে নিশ্চয়ই হাল্কা হয়নি, তবু সাহেবের যত রাগ আমার বিছানা সম্বন্ধে।

মাদ্রাজ ছেড়ে অবধি প্রত্যেক স্টেশনে রবীন্দ্রনাথের দর্শনের লোভে অসম্ভব ভিড়—এমন অবস্থা যে কবির পক্ষে খাওয়া কি ঘুম শক্ত হয়ে উঠল। কবি বিরক্ত হয়ে বললেন, "এ নিশ্চয়ই এণ্ড্রুজের কাণ্ড। কাগজে হয়তো ছাপিয়ে দিয়েছে আমি কুন্নুর যাচ্ছি, তাই পথের মধ্যে দলে দলে লোক আমাকে দেখতে আসছে। আরে, আমি কি সারারাত এই রকম ব'সে কেবলি নমস্কার করতে করতে যাব? যেমন ও বিপদ ঘটিয়েছে তেমনি তার ফলভোগ করুক—ও নিজেই 'দর্শন' দিক। প্রশান্ত, দাও সব জানলাগুলো বন্ধ ক'রে। আমি তো সকলের ঐরকম মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে ব'সে কিছুতেই খেতে পারব না। তাহ'লে কালই হয়তো কাগজে দেখব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অমুক স্টেশনে কলা দিয়ে রুটি মাখন খাচ্ছিলেন, আর একটি মোটা-সোটা ভদ্রমহিলা প্লেটে খাবার তুলে দিচ্ছিল।"—বলেই আমার দিকে তাকিয়ে খুব হেসে উঠলেন।

আমরা তিনজন এক গাড়িতে চলেছি, পাশের কামরায় আরিয়াম্ ও সাহেব। আরিয়াম্ প্রত্যেক স্টেশনে ভিড়ের বহর দেখে অন্য এক কামরায় আশ্রয় নিলেন। কবিকে রক্ষে করার জন্যে ঐ গরমের মধ্যেও গাড়ির সমস্ত কাঠের ঝিলমিলি তুলে দিতে হল। এণ্ড্রুজ সাহেবকে পাশের ঘর থেকে ডেকে এনে কবি বললেন, "তুমি আমার হয়ে এইসব দর্শন-প্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলো। আমার বিশ্রামের দরকার অথচ এরা আগ্রহ ক'রে আম, মালা, কর্পূর ইত্যাদি নিয়ে

আসছে, এদের দুঃখ দিতে বাধে। বুঝিয়ে বলো যে, আমি অসুস্থ, তাই বিশ্রাম করব ব'লে গাড়ির দরজা জানালা বন্ধ ক'রে দিয়েছি—সবাই যেন আমাকে ক্ষমা করে। তুমি আমার প্রতিনিধি হয়ে এদের অর্ঘ্য নিয়ো এবং মিষ্টি কথা ব'লে খুশি ক'রে দিও।"

এণ্ড্রুজের একটা দিক ছিল একেবারে ছেলেমানুষের মতো। ঐ যে কবি একটা ভার দিয়েছেন এবং বলেছেন "খুশি ক'রে দিও", তাই ভদ্রলোক সারারাত না ঘুমিয়ে প্রত্যেক স্টেশনে নেবে নেবে আগন্তুকদের সঙ্গে কথা বলেছেন, কবি সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল মিটিয়েছেন, অর্ঘ্য নিয়েছেন, মালা পরেছেন—এককথায় সত্যিই তাদের খুশি ক'রে দিয়েছেন।

ভোরবেলা—পাহাড়তলীতে গাড়ি গিয়ে থামল। সাহেব একরাশ মালা, আম ও কর্পূর হাতে নিয়ে একগাল হেসে কবির কাছে এসে দাঁড়ালেন—"গুরুদেব, ত্যাখো, তোমার হয়ে কত মালা আমাকে পরতে হয়েছে। সারারাত ধ'রে দলে দলে লোক তোমাকে দেখবে ব'লে এসেছিল এইসব অর্ঘ্য নিয়ে। কিন্তু তুমি অসুস্থ, সেইকথা তাদের বুঝিয়ে বলায় তারা তোমার গাড়ির দরজায় ধাক্কা না মেরে আমাকেই মালা পরিয়ে গেল।"

এণ্ড্রুজ চিরকুমার ; তাই মালার কথায় কবির রসিকতার জোয়ার এল। তৎক্ষণাৎ ব'লে উঠলেন, "দেখো, মালা যারা পরিয়েছিল তাদের মধ্যে কোনো মেয়ে ছিল না তো?" শুনে সাহেবের কী হাসি—আমরাও হেসে খুন।

কুন্নুরে ট্রেনে না গিয়ে মোটরে যাবার আগ্রহই কবির

বেশি হবে, একথা আমরা জানতাম। এই নিয়েও এণ্ড্রুজের সঙ্গে আমাদের মতান্তর ঘটেছিল মাদ্রাজ ছাড়বার সময়। আমার স্বামী বলেছিলেন, কুন্নুর পর্যন্ত রেলের টিকিট না কিনে শুধু মেটুপালম্ অবধি কিনতে, কারণ কবি হয়তো পাহাড়ের ছোট গাড়িতে চড়ার চেয়ে মোটরে যাওয়াটাই বেশি উপভোগ করবেন। সাহেব জোর ক'রে বললেন, "না, গুরুদেবের মোটরে অতটা যেতে কষ্ট হবে।" আমার স্বামী আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে চুপ ক'রে গেলেন। কুন্নুর পর্যন্তই গাড়ি রিজার্ভ করা হল।

ভোরে স্টেশনে নেমে দেখি ছোট রেলগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সাহেব ও আরিয়াম্ জিনিসপত্র নিয়ে রেলের কামরার দিকে যেই চ'লে গেলেন অমনি কবি বললেন, "প্রশান্ত,—ছাখোনা, একটা মোটর জোগাড় করতে পারো কি না।"

দু-চারখানা ট্যাক্সি যাত্রীর অপেক্ষায় স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়েছিল, তার একটা ঠিক করায় কবি গিয়ে সোজা চ'ড়ে বসলেন। এণ্ড্রুজ আমাদের ডাকতে এসে দেখেন আমরা তিনজনেই মোটরে চ'ড়ে বসেছি। কবি বললেন, "ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে রেলে আমি যেতে পারব না। তুমি ও আরিয়াম্ জিনিস নিয়ে যাও, রিজার্ভ গাড়ি—আরামেই যাবে। আমরা তিনজন মোটরে যাচ্ছি।" আমরা আগেই জানতাম এই হবে, সেই জন্যেই সাহেবকে উনি বারণ করেছিলেন কুন্নুর পর্যন্ত টিকিট কিনতে। বহুদিনের অভিজ্ঞতায় এই জ্ঞান হয়েছিল যে, শেষ মুহূর্তে ব্যবস্থা বদলের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হয় কবির সঙ্গে ঘুরতে হ'লে, কাজেই নানারকম ব্যবস্থা বেশি

দূর পর্যন্ত না করাই বুদ্ধির কাজ। সাহেব দু-একবার কবিকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, মোটরে ক্লান্তি বেশি হবে কিন্তু কবি চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। অগত্যা সাহেবও মোটরে চ'ড়ে বসলেন, এবং একা একা আরিয়াম্‌কে জিনিসপত্র নিয়ে ট্রেনে যেতে হল।

বোধহয় মাত্র সতের মাইল পথ। কাজেই অল্পক্ষণের মধ্যেই কুন্নুরে পৌঁছে, মাদ্রাজের অসহ্য গরমের কথা স্মরণ ক'রে মনে হল যেন স্বর্গে এসেছি। সকলেরই মন খুব খুশি। বসবার ঘরে মহারাজা কবির সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন, আমি সেই ফাঁকে সব জিনিসপত্র খুলে সাজিয়ে ফেলব মনে ক'রে পাশেই শোবার ঘরে গেলাম। ঘরে ঢুকেই চক্ষু স্থির! একটা খাটে শুধু ছোবড়ার গদি পাতা—বিছানার কোনো চিহ্ন নেই। কিন্তু একটা আলমারিতে অতিথিদের ব্যবহারের জন্য এত রকম জিনিস রাখা হয়েছে যা দিয়ে অনায়াসেই একটা ছোট-খাট মনিহারির দোকান খোলা যায়। সাবান, পাউডার, ওডিকলোন, সেণ্ট, ক্রীম, যতরকম প্রসাধনের জিনিস হ'তে পারে তার কোনোটাই বাদ পড়েনি। এছাড়া চকোলেট, লজেন্স, বিস্কুট, জ্যাম, জেলি, মাস্টার্ড, সস্‌, ওট্‌মিল, ড্যালা চিনি, কফির টিন, চায়ের প্যাকেট, সোডা, লেমনেড, সিরাপ ও শেষকালে মদের বোতল পর্য্যন্ত। নেই কেবল খাটের উপর বিছানা।

মহারাজার এটা ভাড়া-বাড়ি। একটা বড় বাড়ি, সেটাতে নিজেরা রয়েছেন, আর ছোট্টো একটা 'কটেজ' বাগানের মধ্যে —সেইটাতে অতিথিকে থাকতে দিয়েছেন। এছাড়াও আধ মাইল আন্দাজ দূরে আর একখানা বাড়ি ভাড়া করেছেন

কবিরই জন্যে, কারণ দলের সবাইকে এই ছোট্টো আস্তানায় ধরা সম্ভব নয়!

কটেজটাতে পর পর তিনখানা ছোটো ছোটো ঘর। ঢুকেই প্রথমটা বসবার আর তার পরের দুটো শোবার। সঙ্গে দুটো স্নানের ঘরও আছে। ঘরগুলোতে আলাদা যাবার কোনো রাস্তা নেই—প্রত্যেকখানা ঘরের ভেতর দিয়েই পরের ঘরটাতে যেতে হয়। তাই স্থির হল, প্রথম বসবার ঘর দিয়ে ঢুকেই মাঝের ঘরখানাতে কবি থাকবেন আর সব শেষেরটাতে আমরা। আরিয়াম্ ও এণ্ড্রুজ সাহেব যাবেন সেই দূরের বাড়িটাতে; কিন্তু ইচ্ছে করলে দুবেলা খাওয়া-দাওয়া একসঙ্গেই হতে পারবে, না হ'লে সেখানেও আলাদা ব্যবস্থা আছে। মহারাজা বেশ রাজকীয় চালেই আতিথ্যের আয়োজন করেছেন।

সবই তো হল, কিন্তু রাত্রে বিছানার কী হবে? সাহেবের বকাবকিতে কবির তোশক গদি না আনলেও গায়ে দেবার বালাপোষ ক'খানা ও আলোয়ান এবং বালিশ সঙ্গে এনেছিলাম। একটা বাড়তি কম্বলও ছিল; সেইটাই তোশকের বদলে শক্ত ছোবড়ার গদির উপর পেতে চাদর দিয়ে শয্যা রচনা করা গেল। রক্ষে যে গায়ের কাপড়গুলো এসেছে। কবির সম্বন্ধে তো ব্যবস্থা হল, এখন নিজেদের পালা। দুটি কম্বল বিনা আর কোনো সম্বল নেই। মাদ্রাজের গরমের পরে কুনুরের শীতটাও প্রচণ্ড মনে হচ্ছে। প্রায় কান্না পেতে লাগল মাদ্রাজে ফেলে-আসা বিছানার কথা মনে ক'রে। যাই হোক, রাত্রে ছোবড়ার গদির উপর সুজনি পেতে এক একটা চামড়ার বালিশ মাথায় দিয়ে একটি মাত্র কম্বলেই

খুশি থাকতে হবে—তা ছাড়া আর উপায় কী? সাহেব বিছানার এই রকম আয়োজন দেখে বললেন, "It is very strange, Rani. You were wise to bring at least Gurudev's bedding." এর পরে আর সাহেবের উপর রাগ করি কোন্ মুখে? বুঝলাম উনি নিজের ভুলের জন্যে খুবই লজ্জিত; বিশেষ ক'রে আরো লজ্জিত হয়েছেন আমাকে অত বকেছিলেন ব'লে।

এণ্ড্রুজ সাহেবের গাম্ভীর্যটাই লোকে জানে। কত কাজ করেছেন, কত দেশবিদেশের বড় বড় সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, বড়লাটের সঙ্গে দেখা করছেন, মহাত্মাজীর কাছে পরামর্শ নিচ্ছেন, শান্তিনিকেতনের জন্য পরিশ্রম করছেন—ওঁর এই ছবিটাই সাধারণের কাছে পরিচিত। কিন্তু ওঁর মধ্যে যে একটি পাগল শিশুও লুকোনো ছিল সে খবর বোধহয় অনেকেই জানে না, সেইজন্যেই সেবারকার সেই গল্প লিখতে ইচ্ছে করছে।

প্রথম রাত্রেই মজার কাণ্ড! রাত সাড়ে ন'টা দশটা হবে। খাবার পর খানিকটা গল্পসল্প ক'রে কবি বললেন, "এণ্ড্রুজ, এবারে তোমাদের বাসায় যাও, আমরা দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়ি।" পথশ্রমে সকলেই ক্লান্ত, ঘুম পাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবছি, একখানা কম্বলে যদি শীত না যায় তো কী করব? অত দুঃখের মধ্যেও কবির বিছানাটা অন্তত সঙ্গে এনেছি বলে মনে মনে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করছি। হঠাৎ সাহেব বললেন, "গুরুদেব, তোমাকে ছেড়ে এত দূরে যেতে আমার ইচ্ছে করছে না। আমি এই কৌচটার উপরেই শুয়ে থাকব।" কবি স্নানের ঘরের অভাব জানিয়ে সাহেবের প্রস্তাবে

আপত্তি করায় সাহেব চ'লে গেলে আমরা সদর দরজা বন্ধ ক'রে যে যার ম'তো শুয়ে পড়লাম। আগেই বলেছি, কবির ঘর দিয়ে আমাদের ঘরে যেতে হয়। আমাদের ঘরের দরজাটা ভেতর থেকে আগল না দিয়ে ভেজিয়ে রেখেছি, যাতে হঠাৎ কোনো দরকার হ'লে কবি সহজে ডাকতে পারেন।

রাত এগারোটা কি বারোটা হবে। সবে ভালো ক'রে ঘুমটা জমেছে, হঠাৎ জেগে গিয়ে কবির গলা কানে এলো: "এণ্ড্রুজ, তুমি খবরদার ওদের ঘরে ঢুকো না, ওরা এখন ঘুমোচ্ছে; তুমি কী ব'লে এই সময় ও ঘরে যাচ্ছো? শোবার ঘরে ঢোকাটা যে ভদ্রতা নয় তা কি ইংরেজ হ'য়েও তুমি জানো না?" আর সঙ্গে সঙ্গে ধড়াস ক'রে এসে দরজাটা আমার খাটের গায়ে লাগল—চোখ মেলে দেখি, এণ্ড্রুজ সাহেব খাটের পাশে দাঁড়িয়ে। খুব অপরাধী কচি ছেলের মতো মুখ ক'রে বললেন, "প্রশান্ত, আমাকে একখানা কম্বল দিতে পারো?" উনি থতমত খেয়ে নিজের কম্বলখানা গায়ের থেকে খুলে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, এইখানা নিয়ে যান।" সাহেব নিজে জোর ক'রে বিছানা আনতে দেননি, তার উপরে গায়ের থেকে গরম কাপড় তুলে নিয়ে যেতে বেজায় অপ্রস্তুত বোধ করলেন। বললেন, "না না, কম্বলের দরকার নেই, আমার এইটে হ'লেই হবে।" ব'লে আমাদের জুতো, বই, কাপড় এবং নানা রকম টুকিটাকি-ভরা হোল্ড-অল্‌টা যেই মাটি থেকে টান মেরে তুলেছেন অমনি সব জিনিসপত্র ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল। সেই জিনিস এত রাত্রে আবার সব গুছিয়ে তুলতে হবে —মহা হাঙ্গামা। আমার স্বামী তো জোর ক'রে সাহেবের ঘাড়ে কম্বলটা চাপিয়ে দিয়ে বললেন, "আমরা দুজনে একটাতে

কোনো মতে চালিয়ে নেব। আপনি কম্বলটা নিয়ে চলে যান তো একটু নিশ্চিন্ত হয়ে সবাই ঘুমোতে পারি।"

অগত্যা সাহেবকে যেতেই হল।

দরজা-টরজা বন্ধ ক'রে শুয়েছি। আবার ঘণ্টা দুই পরে পাশের ঘরে হৈ হৈ। কবি সাহেবকে ধ'রে বকছেন, "নিজেও ঘুমোবে না, আমাদেরও ঘুমোতে দেবে না। এ তো বেজায় মুশকিল হলো দেখি। স্বামী-স্ত্রীর শোবার ঘরে যে মাঝরাত্রে ওরকম ঢুকে পড়তে নেই এ তুমি কি ক'রে ভুলে গেলে জানিনে। ইংরেজ হয়ে এইটুকু ভদ্র রীতিও কি তুমি শেখোনি? এ কী রকমের তোমার ব্যবহার?" কবি তখন সত্যিই রেগে গিয়েছেন। আমরা তো শুনছি আর খুব হাসছি, এবং ইচ্ছে ক'রেই সাড়া দিচ্ছিনে যে, দেখি শেষ পর্যন্ত কী হয়। এত বকুনি সত্ত্বেও সাহেব আবার সোজা ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত—"প্রশান্ত, রানী বিছানা আন্‌তে চেয়েছিল আর আমিই জোর ক'রে বাধা দিয়েছিলাম, কাজেই এ কম্বল আমার নেবার কোনো অধিকার নেই। এটা তোমাকে ফিরিয়ে দিতে এসেছি।" আমরা দুজনেই এই ছেলেমানুষির জন্যে সাহেবকে খুব বকুনি দিয়ে কম্বল-কাঁধে ওঁকে আবার ফেরত পাঠালাম। বাকি রাতটা ভয়ে ভয়ে কাটলো যে, সাহেব আবার কখন এসে উপস্থিত হন।

•
•

দুদিন পরে সকালে সাহেব একটা লেখা এনে কবিকে দিয়ে বললেন, "গুরুদেব, খালি তুমিই গল্প লেখো; দ্যাখো, আমিও আজ একটা গল্প লিখেছি।" গল্পে ভদ্রলোক তাঁর সেদিনকার রাত্রের দুঃখের কাহিনী সব লিখে ফেলেছেন—ব্যাপারটা হচ্ছে এই।

খাবার পরে কবি যখন সাহেবকে শুতে যেতে বললেন তখন বাসায় না গিয়ে তিনি বাগানের মধ্যেকার কাঠের 'পারগোলা'টাতে আশ্রয় নিয়েছিলেন; মনে ভেবেছিলেন চারিদিকের ত্রিপলের পরদা ফেলে দিলেই আর শীত লাগবে না। খানিক পরেই সেখানে একটি লোক এসে জুটল, সে এসে ওঁকে বলল, "আমাকে ধর্মোপদেশ দাও।" লোকটার ভক্তি দেখে তো সাহেব মহা খুশি। খানিকক্ষণ আলোচনার পর সে যখন পাঁচটা টাকা ধার চাইল তখন বুঝলেন, লোকটা ভণ্ড—দিলেন তাকে তাড়িয়ে। রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শীত বাড়তে লাগল। বাধ্য হয়ে এলেন সেই কম্বল চাইতে, কিন্তু আমার স্বামীর গায়ের থেকে গরম কাপড় তুলে নিয়ে গিয়ে এত অনুশোচনা হল যে, ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা না ক'রে থাকতে পারলেন না। কিন্তু আমাদের সকলেরই কাছে বকুনি খেয়ে বাধ্য হয়ে যখন কম্বল নিয়েই ফের ফিরে আসতে হল—তবু সেটা গায়ে দিয়ে নিজের শীত নিবারণ করেননি। অন্যায় করলে তার প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত ব'লে সারারাত ঐ বাগানের কাঠের বেঞ্চিতে ব'সে কেঁপেছেন আর কম্বলটা পাশে পাট ক'রে রেখে দিয়েছেন। যুক্তিটা হচ্ছে এই যে "আমার জন্যেই যখন রানী ও প্রশান্ত বিছানা আনতে পারেনি তখন আমারও আরাম ক'রে গরম কাপড় গায়ে দেওয়া উচিত নয়— অতএব সারারাত শীত ভোগ করতে হবে।" কবি ঠাট্টা ক'রে বললেন, "একেই বলে খাঁটি খ্রীস্টান। এতে লাভ হল কার? প্রশান্ত যখন কাপড়খানা নিলই না ফিরে, তখন তুমিও সেটা ব্যবহার না ক'রে শীতে কাঁপবার কী মানে? কম্বল থেকেও কারো ভোগে লাগল না, এটার মধ্যে কি কোনো বুদ্ধির পরিচয়

আছে ?" ভবিষ্যতে এরকম ঘটনা যাতে আর না ঘটে সেই জন্যে আমরা সবাই মিলে সাহেবকে খুব ঠাট্টা করলাম। এ ব্যাপার এক এণ্ড্রুজ সাহেব ছাড়া আর কারো দ্বারাই সম্ভব হত না।

কুন্নুরে কবি ঠাণ্ডার জন্যেই হোক বা জায়গার গুণেই হোক অনেকটা সুস্থ বোধ করতে লাগলেন। শরীরের আরো উন্নতি হত যদি মহারাজ অতিথি-সেবার আয়োজন একটু কম করতেন।

কবি স্বভাবতই স্বল্লাহারী; কুন্নুরে গিয়ে খাওয়া আরো গেল ক'মে। কারণ এত প্রচুর পরিমাণে নানারকম খাদ্য তিন বেলা তাঁকে দেখতে হত যে, ভোজ্য পদার্থমাত্রেরই প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মে গেল।

আমাদের তিনজনের সেই বসবার ঘরেই খাবার জায়গা। এত রকম জিনিস আসত যে, যে টেবিলটা ঘরে ছিল তাতে কুলোত না। প্রত্যেকবার খাবার সময় ঘরের একপাশে দুটো তেপায়া টেবিল দুদিকে রেখে তার উপর কাঠের তক্তা ফেলে লম্বা আর একটা টেবিল বানাতে হত। নইলে অতগুলো পাত্র রাখা হবে কোথায়? কবি অসহায়ভাবে ব'সে ব'সে এইসব আয়োজন দেখতেন। তারপর যখন একটার পর একটা ডিস্ আসছে তো আসছেই তখন ওঁর মুখে এমন করুণভাব ফুটে উঠত যে, দেখলে মনে হয় যেন কোন শারীরিক কষ্ট হ'চ্ছে। প্রত্যেকটা জিনিস ওঁর সামনে আসছে আর উনি "না" বলছেন, আবার সেটা সরিয়ে রেখে আর একটা নতুন থালা, এবং সঙ্গে সঙ্গে মহারাজার উক্তি যে, "এটা মহারানী নিজে তৈরি করেছেন আপনার জন্যে।" মহারানীর পরদা, কাজেই তিনি থাকতেন নেপথ্যে। মহারাজ ব'সে থেকে খাওয়াতেন।

প্রথমদিন ভদ্রতার খাতিরে কবি এক-আধটা জিনিস চেখে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অন্ধ্রদেশীয় রান্নায় এত অসম্ভব ঝাল! তাছাড়া পর্ব্বতপরিমাণ খাবার প্রত্যেকবার দেখতে দেখতে ওঁর খাওয়া প্রায় বন্ধ, এবং আমাদেরও পর্যন্ত সেই দশা হবার জোগাড়। প্রথমে বিলিতি রান্না—যত রকমের যা কিছু কল্পনা করা যায়, অর্থাৎ পরিজ, স্রেডড্ হুইট্, ফোর্স ইত্যাদি যা কিছু প্রাতরাশে খায়। তারপর ডিমের সচরাচর যত রকম বৈচিত্র্য হতে পারে, তারপর মাছেরও তাই এবং মাংসেরও। এগুলো হল বিদেশী পর্ব। এবারে শুরু দেশী রান্নার—তার আর অন্ত নেই। প্রত্যেকটাই দু-রকম ভাবে রান্না—ঝাল ও আ-ঝালা। কাজেই তক্তা ফেলে টেবিল না বানালে ধরবে কোথায়? কবি খাবার কোনো চেষ্টাও করতেন না, চেয়ে দেখেই ঘাড় নাড়তেন আর চাকরে প্লেট সরিয়ে নিত। এই রকম ক'রে ক'রে যখন সব স'রে যেত শেষকালে ফলের বাসন থেকে একটা কিছু তুলে নিতেন। ক্বচিৎ কখনও মহারাজের বিশেষ অনুরোধে যদি কোনো একটা ডিস্ থেকে এক টুক্‌রো কিছু তুলে নিতেন তবে সেটা আর মুখ পর্যন্ত উঠত না—নাড়াচাড়া ক'রে প্লেটেই ফেলে রাখতেন। আমি কিছু বল্‌লে আস্তে আস্তে বলতেন, "আমার এত গা-কেমন করছে যে কিছু মুখে দিতে গেলে টেবিলের ভদ্রতা বাঁচানো দায় হবে।" যেদিন সাহেব আমাদের খাবার টেবিলে উপস্থিত থাকতেন সেদিন কবির একটু সুবিধা হত। এণ্ড্রুজ মহারাজকে কথায় বার্তায় অন্যমনস্ক ক'রে দিতেন আর সেই ফাঁকে কবির খাওয়া শেষ হয়ে যেত।

রবীন্দ্রনাথের চিরকালই খুব ভোরে চা খাওয়া অভ্যেস,

কারণ বরাবরই উনি তিনটে থেকে চারটের মধ্যে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তেন। এই জন্যে বিদেশেও যখন যেখানে থেকেছেন সব হোটেলের ম্যানেজারই ওঁর জন্যে আলাদা বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছে—অবিশ্যি ভোর ছ'টায় চা-রুটি পাবার জন্যে বেশি ক'রে দামও দিতে হয়েছে। মনে আছে নরওয়েতে কবি যাঁদের বাড়ি অতিথি ছিলেন তাঁরা কবিকে বিশেষ ক'রে ভোর সাড়ে পাঁচটায় চা দেবার জন্যে আলাদা একটি পরিচারিকার ব্যবস্থা করেন। আমরা দুজন কবির সঙ্গেই তাঁর ঘরে বসে সাড়ে পাঁচটায় খাওয়া শেষ ক'রে নিতাম আর মিঃ ও মিসেস্ ভালাহান্মান্-এর সাক্ষাৎ মিল্‌ত বেলা ন'টায়।

পিঠাপুরমের মহারাজা ভারতীয় ধনী লোক, কাজেই প্রথম দিন সকলেই লক্ষ্য করলাম, তাঁদের বাড়ির চাকরবাকরও কেউ বেলা ন'টার আগে ঘুম থেকে ওঠে না—মনিবদের তো বেলা বারোটায় দর্শন মেলে। এবং তারও পরে মহারাজা আমাদের ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চের সব খাবারগুলো একসঙ্গে খাওয়াতে আসেন, তাই বোধ হয় অত রকমের পদ।

যাই হোক, প্রথম দিন যখন দেখা গেল সাড়ে দশটার আগে চা পাবার আর আশা নেই তখন ভেবে চিন্তে একটা বুদ্ধি বের করা হল। রাত্রে খাবার পরে চাকরটাকে বললাম—যদি ফ্লাস্কে একটু গরম চা ও একটা পাত্রে দুধ ও কিছু রুটি মাখন ঘরে রেখে দিয়ে যায় তা হ'লে আর কিছুই হাঙ্গামা হয় না; অতি সহজেই ভোরে কবিকে চা খাইয়ে দিতে পারি। ওমা! তারপরে যা ঘটল তাতে ছেলেবেলার কবিতা "অবাক কাণ্ড ভাই, এমন ব্যাপার আর কখনও জন্মে দেখি নাই" মনে

পড়ল। আমি ফ্লাস্কের কথা বল্‌বামাত্র সে তৎক্ষণাৎ তিনটে গ্যালন ফ্লাস্ক নিয়ে এসে হাজির। একটাতে চা, একটাতে কফি আর বাকিটাতে দুধ। খাব আমরা তিনজনে, তার জন্যে এল তিনখানা পাউরুটি—স্লাইস্‌ ক'রে কাটা, তিনখানা আস্ত এবং তিনখানা কেটে তাতে মাখন মাখানো। এছাড়া মিষ্টি রুটি (Bun), জ্যাম্‌, জেলি তো আছেই। যাই হোক, খাবারটা ভোরেই হাতে পাওয়া যাবে মনে ক'রে চুপ ক'রে রইলাম।

রাত্রে প্রতিদিন এইরকম জলখাবার টেবিলের উপর কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে যায়, আমরা ভোরে সাড়ে পাঁচটা ছ'টায় খাওয়া চুকিয়ে ফেলি। সেই সময়টাতেই কবি যা একটু কফি, রুটি ইত্যাদি খেয়ে নেন; তার পর সারাদিনের মধ্যে ঐ একটু আধটু ফল।

ফলেরও একটা মজা আছে। প্রথমদিনই বিকেলবেলা চায়ের সময়ে পেয়ালা ভ'রে আমের রস এল। আমি ও কবি যে দুটো পেয়ালা তুলে নিলাম তারা কিছু গোলমাল করল না, কিন্তু অধ্যাপক যেই এক চুমুক দিয়েছেন অমনি দেখি, চোখে জল ভ'রে এসেছে—মহারাজা সামনে ব'সে, কাজেই ফেলতেও পারেন না, গিলতেও পারেন না। অমন লোভনীয় সোনার বরণ আমের রসের ভিতর প্রচুর লঙ্কার গুঁড়ো মেশানো থাকবে, একথা কে কল্পনা করেছিল?

সেদিন ওঁর অবস্থা দেখে কবি পরে বলেছিলেন, "ওহে প্রশান্ত, অন্ধ্রদেশীয় আমের রসকেও বিশ্বাস নেই। আজ বড্ড ফাঁড়া কেটেছে রানীর আর আমার। ভবিষ্যতে আর কোনোদিন ও-রস দেখে লোভ করছিনে। সাধে শাস্ত্রে বলেছে, লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।"

সত্যিই প্রায় মরণদশা—যে মানুষ বাড়িতে লঙ্কা এসেছে শুনলে ভয় পান তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হল বিষঝাল আমের রস গিলে।

আম রোজ মহারাজার বাগান থেকে পার্সেলে আসত। তারপর টেবিলে সেটাকে পরিবেশন করা হত টিপে টিপে একেবারে তলতলে নরম ক'রে দিয়ে—উদ্দেশ্য যাতে খোসাটাতে ফুটো ক'রে মুখ দিয়ে চুষে খেতে পরিশ্রম না হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছেলেমানুষের মতো দুহাতে আম ধ'রে চুষে খাচ্ছেন, আর মাঝে মাঝে দাড়ি বেয়ে রস গড়িয়ে পড়ছে, এটা যে কিরকম 'কমিক' দেখতে তা নিজেই কল্পনা ক'রে খেতে খেতে বার বার হেসে উঠতেন, অথচ এমন তলতলে আম, যে তাকে কেটে খাবারও যো নেই। ভাগ্যি যে, এটা সেই ভোরের খাবারের সঙ্গে চলত, কাজেই মহারাজা উপস্থিত থাকতেন না। কবি আম খাবার সময় রোজ বলতেন, "আচ্ছা, একি ছেলেমানুষি বল তো? ভদ্রভাবে আম খাবারও উপায় নেই? তিনজনে তিন শিশুর মতো আম মুখে দিয়ে চুষতে লেগেছি আর দাড়ি বেয়ে রস পড়ছে। আহা, কী দৃশ্য!"

প্রথম দিন তো আম খাবার সময় কবিও যত হাসেন আমরাও তত হাসি। অথচ লঙ্কার ভয়ে রসের পেয়ালা প্রতিদিন ফেরৎ যাচ্ছে। রসের পেয়ালা দেখলেই কবি বলতেন, "কাজ নেই বাপু, শেষে প্রশান্তের মতো হঠাৎ দেখবো 'বেদনায় ভ'রে গিয়েচে পেয়ালা'। তার চেয়ে না হয় অল্পক্ষণের জন্যে শৈশব-দশাতে ফিরে গেলুমই বা।"

কুন্নুরে জলহাওয়ার গুণে রবীন্দ্রনাথের শরীর অনেকটা

সুস্থ বোধ হতে লাগল, মনও খুব খুশি—শুধু এক যা খাওয়ার অত্যাচার। একদিন অধ্যাপককে বললেন, "ছাখো, এখানে বেশ আরামেই ছিলুম, কোন লোকজনের উপদ্রব নেই, গরমের কষ্ট নেই, তোমারও দিনরাত অঙ্ক কষায় ব্যাঘাত ঘটছে না, কিন্তু এরা দেখছি আমাদের খাইয়েই তাড়াবে।"

কয়েকদিন পরের কথা—সন্ধ্যেবেলা ব'সে আছি, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, আমাদের রাত্রের খাওয়া শেষ, কাজেই আরিয়াম্ ও এণ্ড্রুজ চ'লে গেছেন নিজেদের বাসায়; শুতে যেতে তখনও অনেক দেরি—আমরা দুজনে কবিকে ধরলাম একটা গল্প বলুন। বললেন, "আচ্ছা, লাগে। এরকম কাজ আগেও ঢের করেছি। কুচবিহারের মহারানী সুনীতি দেবীর একটা নেশা ছিল আমার মুখে গল্প শোনা। গল্পগুচ্ছের 'দুরাশা' গল্পটা, সেই যাতে ক্যাল্‌কাটা রোড আছে—ওঁকেই মুখে মুখে বলেছিলুম। এরকম আরো অনেক গল্প তিনি আমার কাছে আদায় করেছিলেন, যেগুলো পরে গল্পগুচ্ছতে ছাপা হয়েছে – যেমন 'মাষ্টারমশাই', 'মণিমালা' ইত্যাদি। তাঁর আবার ভূতের গল্প বেজায় পছন্দ ছিল, কাজেই কেবলি জিজ্ঞাসা করতেন, 'আপনি ভূত দেখেছেন? সত্যি রবিবাবু, আপনি বলুন না যে ভূত দেখেছেন কিনা।' যত বলি যে না, এখনও তাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি ততই বলেন এ কখনো হতেই পারে না—বলতেই হবে আজ একটা ভূতের গল্প। এইরকম সব দিনেই বাধ্য হয়ে কঙ্কালকে সর্বাঙ্গে গহনা পরাতে হয়েছে, মাস্টারমশায়কে ঠিকে গাড়ির ভিতর আত্মহত্যা করাতে হয়েছে —নইলে ভূতের গল্প কোথায় পাই বলো? যেদিন 'মাস্টার-মশাই'টা বানিয়েছিলুম সেদিন ভারি মজা হয়েছিল। রাত্রে

আলিপুরে 'Woodlands'-এ মহারানীর কাছে খাবার নেমন্তন্ন। খাবার পরে সেই এক কথা 'রবিবাবু, আজ আপনাকে একটা ভূতের গল্প বলতেই হবে।' বললুম, 'ঠিক ভূত কি আর কিছু জানিনে, তবে এর আগের বারে যেদিন আপনাদের বাড়ি খেতে এসেছিলুম সেদিন ফিরে যাবার সময় এক অদ্ভুত কাণ্ড!' চারিদিক থেকে অমনি 'কি' 'কি' প্রশ্ন। আমি ধীরে-সুস্থে আরম্ভ করলুম যে, নাটোরের মহারাজা আর আমি তো বেরোলুম আপনাদের বাড়ি থেকে হেঁটে—পথে একটা ঠিকে গাড়ি জোগাড় ক'রে নেব স্থির করেছিলুম। একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ময়দানের ভিতর দিয়ে এসে চৌরঙ্গীতে পড়া গেল। ঠিকে গাড়ির আড্ডায় দুখানামাত্র গাড়ি—একখানা নাটোর নিলেন, অন্যখানাতে আমি চ'ড়ে ব'সে জোড়াসাঁকো নিয়ে যেতে বললুম। গাড়োয়ানটাতো স্ট্যাণ্ড ছেড়ে কিছুতেই যাবে না; বলে, 'বারোটা বাজে বাবু, আর আমি ভাড়া খাটব না।' শেষে পুলিশের ভয় দেখানোতে অগত্যা রাজী হল। বললুম, 'ময়দানের ভিতর দিয়ে চলো।' চলেছি তো চলেইছি, রাস্তা আর শেষই হয় না। কেবলই একই জায়গায় গাড়ি ঘুরে আসছে চক্কর দিয়ে। যতই চেঁচিয়ে গাড়োয়ানকে বকি কিছুই ফল হয় না! খানিক পরে হঠাৎ মনে হল সামনের সিট-এ কে যেন ব'সে রয়েছে—স্পষ্ট কেউ নয়, শুধু জ্বলজ্বলে বড় বড় চোখদুটো আর একটা হাসি যেন দেখতে পাচ্ছি। ব্যাপারটা কিরকম একটু ঘোরাল মনে হল। যাই হোক, সারারাত এমনি ঘুরে ঘুরে প্রায় যখন ভোর হয়ে এসেছে তখন হঠাৎ গাড়িখানা আবার স্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়াল। গাড়োয়ানটাকে খুব বকাবকি করলাম। সে

বললে, 'কি করব বাবু, আমি তো আপনাকে বারণ করেছিলুম আমার গাড়ি নিতে। রাত বারোটার পরে আমি আড্ডা থেকে গাড়ি বের করলেই আমার এই দশা হয়—কে যেন আমাকে ঐ রাস্তায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়, তারপর আবার ভোর বেলা এখানে ফিরে আসি।' আমি সেদিন তাকে খুব শাসিয়ে গেলুম, থানায় তার নামে নালিশ করব ব'লে। জোড়াসাঁকো থানাতে যখন এজাহার দিতে গিয়েছি তখন পুলিশ দারোগাটি হঠাৎ চম্‌কে উঠে বললে, 'কত নম্বর গাড়ি বললেন? ও, ঐ নম্বর? আপনি ওটা সম্বন্ধে কিছু জানেন না?' আমি তো অবাক! 'জানব আবার কী? গাড়োয়ানের দুষ্টুমিই তো জানি, আর সেই কথা বলতেই তো এখানে এলুম।' দারোগা হেসে বললে, 'না মশায়, দুষ্টুমি নয়। ঐ গাড়িতে কিছুদিন আগে একটা লোক রাত বারোটার সময় গড়ের মাঠের মাঝখানে আত্মহত্যা করেছিল। গাড়োয়ানকে বলেছিল গঙ্গার ধারে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যেতে, তারপর গাড়ির মধ্যে নিজে কাজ সেরেছে। সেই থেকে ঐ গাড়ি বারোটার পরে আড্ডা থেকে বেরোলেই আর নিজের গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারে না, সারারাত গড়ের মাঠে ঘুরে ঘুরে শেষকালে ভোরবেলা গাড়ির আড্ডায় ফিরে আসে। কিন্তু সারাদিন আর কোনো মুশকিল নেই। সেই জন্যেই গাড়োয়ানটা রাত বারোটার কাছাকাছি ভাড়া খাটতে চায় না; অথচ ভূতুড়ে গাড়ি নাম হ'লে দিনেও ভাড়া হবে না ব'লে একথা কাউকে বলতেও নারাজ।' এতক্ষণ মহারানী প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে আমার গল্প শুনছিলেন—বড় বড় চোখ উৎকণ্ঠায় একেবারে আরো বড়ো হয়ে গেছে। আমি থামতেই বললেন, 'রবিবাবু,

সত্যি?' আমি গম্ভীর মুখে উত্তর করলুম, 'না, সত্যি নয়।' ঘরসুদ্ধু সবাই হো হো ক'রে হেসে উঠলো। মহারানী ছেলেমানুষের মতো দুঃখিত হয়ে কেবলি বলতে লাগলেন, 'রবিবাবু, এ গল্পটা কেন সত্যি হল না? সত্যি হ'লে বেশ হত।' তিনি বড় আশা করেছিলেন যে, এতদিন পরে একটা জ্যান্ত ভূতের গল্প আমার কাছ থেকে পেলেন। ওঁর যে কী রকম ভূত বিশ্বাস করতে আগ্রহ ছিল তা বলতে পারিনে। এমনি ক'রে ওঁর জন্যেই আমার কয়েকটা ছোট গল্প মুখে মুখে তৈরী হয়ে উঠেছিল। আজ আবার তোমরা ধরেছ, দেখি এটা কিরকম হয়।"

"ধরো গল্প শুরু করা যাক—টিং টিং টিং টেলিফোন বেজে উঠেছে, বাড়ির একটি মেয়ে গিয়ে ধরল টেলিফোন—ও প্রান্ত থেকে যে কথা কইছে তার গলা অচেনা, ছেলেটি কিছুতেই নামও বললে না। খানিকটা কথা হবার পর হঠাৎ টেলিফোন থেমে গেল। মেয়েটি তো অবাক! কে, কী বৃত্তান্ত, কিছুই জানে না, অথচ কথা বলবার পর থেকে বুকের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়েছে। পরদিন আবার ঘণ্টা। ক্রমে এমন হল যে মেয়েটি রোজ অপেক্ষা ক'রে থাকে বিকেল বেলা টেলিফোন বাজবে ব'লে। যে ছেলেটি কথা বলে সে কিছুতেই নাম ঠিকানা বলে না। শুধু এইটুকু বলেছে যে সেও কখনো মেয়েটিকে দেখেনি, তবু তার কথা এত শুনেছে যে, আলাপ না ক'রে থাকতে পারল না। মেয়েটির বাড়িতে যে সে আসতে চায় না তার কারণ পাছে দেখা হ'লে তার এই ভালোলাগাটুকু চ'লে যায়, তাই সে দূরে দূরেই রইল। টেলিফোনের ভিতর দিয়ে এই যে পরিচয় সেইটুকুতেই সে

খুশি থাকবে। মেয়েটির কথা কার কাছ থেকে শুনেছে তাও সে কিছুতেই বলতে রাজী নয়। এই রকম ক'রে টেলিফোনের আলাপ যখন বেশ জ'মে উঠেছে এমন সময় হঠাৎ একদিন ছেলেটি বললে যে সে বিদেশে চ'লে যাচ্ছে কাজেই আর গল্প করা হবে না। কিছুদিন পরে মেয়েটি শিলং পাহাড়ে চেঞ্জে গেল। সেখানে একদিন গাড়ির আকস্মিক দুর্ঘটনা। যে ভদ্রলোক সাহায্য করলেন তাঁর গলা শুনে মেয়েটি চম্‌কে উঠল, তিনিও বুঝলেন কাকে সাহায্য করেছেন। টেলিফোনের ভিতর দিয়ে তাদের এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল যে পরস্পরকে চিনতে একটুও দেরি হল না" ইত্যাদি। গল্পটা মোটেই এরকম ছোটো নয় এবং এত শুক্‌নো তো নয়ই। মোটামুটি যা ঝাপ্‌সাভাবে মনে আছে আমি তাই শুধু বললাম। মোট কথা আমরা দুজনেই অত্যন্ত জেদ ধরলাম এটা লিখে ফেলবার জন্যে। কবি কিছুতেই রাজী নন। আমরা যত অনুরোধ করি উনি ততই বলেন, "আমি তো এই বললাম ; এখন তোমরা লিখে রাখো। রানীর সঙ্গে তো আমার একটা বোঝাপড়া হয়েই ছিলো বিলেত থেকে চ'লে আসবার সময় যে, ও একটা গল্প লিখবে, আর তার বদলে আমিও দেশে ফিরে একটা গল্প শুরু করব। আমার কথা আমি রেখেছি—'বিচিত্রা'তে কুমুর গল্পটা শুরু করেছি কিন্তু রানীর কথা রানী রাখেনি—আজ পর্যন্ত কোনো গল্পের নাম নেই।" আমার দিকে চেয়ে বললেন, "এই তো প্লট দিলুম, এইবার তোমার প্রতিজ্ঞা রাখো। এত ক'রে বলছি কুছ পরোয়া নেই, লিখে তো ফেল, তারপর আমি কথা দিচ্ছি যে তাকে এমন ক'রে ঘ'সে মেজে দেব যে কার সাধ্যি

তোমার লেখা ব'লে চিনতে পারে। সবাই বলবে ঠিক যেন রবিঠাকুর বেনামে লিখেছে। হাসছ? বিশ্বাস হচ্ছে না? এ কাজ আমি আগেও অনেকবার করেছি। অনেকদিন আগে আমাদের খামখেয়ালি নামে এক ক্লাব ছিল। তার নিয়ম ছিল সভ্যদের সকলকেই পালা ক'রে এক একবার এক একটা গল্প লিখতে হবে। আমার ভাইপো সমরের একবার পালা—সে তো ব্যাকুল হয়ে পড়ল—'রবিকা, কি করি?' সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, 'তুমি একটা লেখো আমি ঘ'সে মেজে ঠিক ক'রে দেব।' 'পোষ্যপুত্র' গল্পটা যখন সমর পড়ল ক্লাবে কারোই বুঝতে বাকি রইল না ব্যাপারটা কি হয়েছে। সমর যা লিখে দিয়েছিল তার আগাগোড়া কিছুই আমি বাকি রাখিনি। গল্পটা প'ড়ে সমর তো মহা খুশি, কিন্তু বারবার বলতে লাগল, 'এটা আমার লেখা বলা অন্যায় হবে রবিকা।' বললুম, 'চুপ ক'রে যাও না, এতে হয়েছে কী?' ঐ গল্পটা সমরের নামেই আমার কাগজে ছাপিয়েছিলুম।"

অধ্যাপক বললেন, "হ্যাঁ, আমি জানি; কারণ আমি পুরোনো পত্রিকা সব ঘেঁটে আপনার লেখা যখন সংগ্রহ করছিলুম সেই সময় এটা আমার চোখে পড়ে। অনেক প্রবন্ধে ও গল্পে আপনার নাম না থাকলেও আমি ইণ্টারনাল এভিডেন্স থেকে আপনার লেখা উদ্ধার করবার চেষ্টা করছিলুম ব'লে আমার বুঝতে বাকি ছিল না যে, সমরবাবুর নামে ছাপা হ'লেও ওটা আপনারই লেখা। পরে আমি ঐ গল্প এবং আরো অনেক অনামা প্রবন্ধের নিচে আপনাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছিলুম।" কবি হেসে বললেন, "হ্যাঁ, আমার মনে আছে। অনেক লেখা নিয়ে তুমি একদিন আমাকে জেরা করেছিলে।"

আমি কবিকে বললাম, "আচ্ছা, এরকম ক'রে অন্যলোককে দিয়ে লিখিয়ে আপনার লাভ কী? তার চেয়ে গোড়া থেকেই তো নিজে শুরু করা ভালো।"

"না গো, একটা 'চান্স' দিতে চাই তোমাকে জগদ্বিখ্যাত হবার। সবাই যখন আজকাল লিখছে তখন তুমিই বা লিখবে না কেন? স্বয়ং 'সাহিত্যসম্রাট' তোমার সহায়, অতএব ভয় কী? এইবার লাগো, কী বলো?"

আমি হাসতে হাসতে উত্তর করলাম, "আপনি তো চান্স দিচ্ছেন জগদ্বিখ্যাত হবার, কিন্তু ভালোমন্দ কিছু একটা খাড়া ক'রে আপনার হাতে না দিলে আপনি ঘষা-মাজা করবেন কাকে? আমার যে সেটুকু ক্ষমতাও নেই। তবে বুদ্ধিটুকু আছে বোঝবার যে, জগদ্বিখ্যাত হবার চেষ্টা করলেই ভুল হবে। তার চেয়ে চুপ ক'রে থাকাই ভালো।"

"বাঃ, এ কিন্তু তোমার ভারি অন্যায়। বিলেত থেকে চ'লে আসবার সময় আমাকে যখন কথা দিয়েছিলে যে, আমি একটা নতুন গল্প লিখলে তুমিও এবার একটা লেখবার চেষ্টা করবে, তখন সে কথা তোমার রাখা উচিত। ফাঁকি দিয়ে আমাকে আসরে নাবিয়ে দিলে আর নিজে চুপ ক'রে আছ আজও। আমার আচ্ছা গেরো হয়েছে। এমনি হয়তো বেশ আছি, হঠাৎ কুমুর ভাবনা থেকে থেকে আমাকে অস্থির ক'রে তুলছে। কেবলি ভয় যে মধুসূদন কখন কী একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। কুমুর জন্যে আমার আর উৎকণ্ঠার সীমা নেই। এর উপর তোমরা আর একটা ঘাড়ে চাপাতে চাচ্ছ?" আমাদের দুজনেরই সেই এক কথা—"এত ভালো একটা গল্প কিছুতেই হারিয়ে যেতে দেওয়া উচিত হবে না।"

"আচ্ছা, আজকে তো শুয়ে থাকা যাক; কাল আবার যখন একটা গল্প বলব তখন আবার গোলমাল করতে থাকবে এটার চেয়েও সেটা আরও ভালো হয়েছে ব'লে। লিখতে আর আমি পারব না, সে কিন্তু আগেই ব'লে দিচ্ছি। একে রাজকীয় আতিথ্যে প্রায় অনাহারে শুকিয়ে মরছি, তার উপর আবার গল্প লেখার পরিশ্রম? এই বুঝি তোমাদের দয়ামায়া?" সেদিনকার রাত্রের সভা এইখানেই ভঙ্গ হল।

পরদিন সকালে একটা খাতা জোগাড় ক'রে কবির লেখবার টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখলাম। খাতাখানা রাখতে দেখে কবি একটু হেসে চোখ টিপে বললেন, "বুঝেছি তোমার মতলব ভালো নয়, কিন্তু আমি আর ভুলছিনে তোমার কথায়। দিব্যি চা-রুটি খেয়ে এই কৌচের উপর লম্বা-আ-আ ক'রে পা ছড়িয়ে দিয়ে চিত হয়ে পড়ব আর পাখির ডাক শুনব—কে নড়ায় দেখি আমাকে এখান থেকে। অনেক কষ্টে কুমুকে প্রায় শেষ ক'রে এনেছি; কোনোমতে বাকিটুকু লিখে ফেলতে পারলেই ব্যাস্, আমার ছুটি। ঠিক এই সময়ে আবার একটা নতুন গল্প? সে কিছুতেই হচ্ছে না। তোমাকে সঙ্গে এনেছি আমাকে একটু যত্ন করবে, শুশ্রূষা করবে, থেকে থেকে বলবে এইবার আপনি বিশ্রাম করুন,* দিনের বেলায় বিছানার উপর গিয়ে চি-ই-ত হয়ে প'ড়ে থাকুন,

* কবির দিনের বেলা কখনো ঘুমোনো অভ্যাস ছিল না। ইদানীং শরীর খারাপ হওয়াতে আমাদের অনুরোধে খানিকক্ষণ আরাম চৌকিতে পা মেলে দিয়ে বসতেন। কিন্তু প্রতিদিনই তাই নিয়ে অনুযোগ করতেন যে আমরা ওঁর সময় নষ্ট করাচ্ছি, এদিকে কত কাজ প'ড়ে রয়েছে।

ইত্যাদি। কেমন তাই নয়? ওঃ! দিনের বেলা ঘুমোতে তোমার কী ভালোই না লাগে। তাই আমিও সারাটা দিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিই এই তোমার ইচ্ছে। কিন্তু কাল রাত থেকে হঠাৎ তোমার এ কি রকমের বুদ্ধি হল বলো তো? কেবলই ষড়যন্ত্র করছ বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে যে কী ক'রে বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাবে। উনি দেখতে দিব্যি ভালোমানুষটি, কিন্তু সকাল বেলায় উঠেই আমার বিপদ ঘটাবার চেষ্টায় তোমার হাতে খাতাটি জুগিয়ে দিয়েছেন তো? কাল রাত থেকে দেখছি যুগলের খালি পরামর্শ চলেছে।"

যতক্ষণ চা খাওয়া না হল কিছু বললাম না। খাওয়া শেষ হ'লে যেই চেয়ার ছেড়ে উঠে তাড়াতাড়ি কৌচের উপর বসতে যাবেন ঠিক সেই সময় পেছন দিক থেকে এসে ঠেলে ধরতে আর বসতে পারলেন না, খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে উঠলেন; তখন একেবারে হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গিয়ে লেখবার টেবিলের সামনে উপস্থিত করাতে বাধ্য হয়ে চেয়ারে ব'সে পড়লেন। তখন হাসির পালা আমার। বকতে লাগলেন, "আঃ, কী করো? ভারি জেদী মেয়ে। এক এক সময় তুমি সত্যিই অত্যাচার করো আমার উপর।" বকছেন আর হাসছেন ততোধিক। "কখন থেকে মনে মনে ঠিক ক'রে আছি গল্প করতে করতে অন্যমনস্ক ক'রে দিয়ে হঠাৎ গিয়ে কৌচের উপর পা তুলে দেব, তখন আর নড়ায় কার সাধ্য! কিন্তু দেখেছ প্রশান্ত, রানীর অত্যাচার? ঠিক সময়মতো এসে আমাকে ধরেছে। একটু শাসন করো না ওকে। এর বেলা কর্তৃপক্ষ কিছু বলছেন না। আসলে ওঁরও যে এতে সায় আছে।"

অধ্যাপক তো মহাখুশি শেষ পর্যন্ত ওঁকে খাতার সামনে এনে বসাতে পেরেছি ব'লে। এখন কোনোমতে চার পাঁচটা লাইনও শুরু হ'লে হয়—তারপর আর ভাবনা নেই, আপনিই গড় গড় ক'রে এগিয়ে যাবে।

অবশেষে কবি আবার, "আঃ, তুমি বড় জ্বালাতন করো," ব'লে খাতাটা টেনে নিয়ে বসলেন। আগেই ঠিক হয়েছিল, সেদিন আরিয়াম্ ও আমরা দুজনে সকাল বেলা উতকামণ্ডে যাব; ফিরতে সন্ধ্যে হবে, তাই এণ্ড্রুজ সাহেব সারাদিন কবির কাছে থাকবেন।

আমরা তো চ'লে গেলাম। যাবার সময় চেয়ারের পেছন থেকে উঁকি দিয়ে দেখে গেলাম তিন চার লাইন মাত্র লেখা হয়েছে। সন্ধ্যেবেলা যখন ফিরেছি কবি প্রথম কথা বললেন, "হয়েছে খানিকটা। এখন বুঝতে পারছি সহজেই এগোবে। প্রথম কয়েক লাইন একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল, তারপর থেকে একেবারে আপনিই এগোচ্ছে। গল্পের পাত্রপাত্রীদের সঙ্গে এখন বেশ কথাবার্তা চলছে আমার—জানি এরকম হ'লে আর কোনো ভয় নেই।"

যতটুকু লেখা হয়েছিল রাত্রে খাবার পরে আমাদের প'ড়ে শোনালেন। যে গল্প আমাদের আগের দিন বলেছিলেন—দেখি তার কোনো চিহ্নমাত্র নেই এই "অমিট্ রা্এ'র" কাহিনীতে। ভাষা একেবারে নতুন রূপ নিয়েছে, লেখাটা যেন ঝলমল করছে। আমাদের দুজনের মন খুশিতে ভ'রে উঠল। বললাম, "এ গল্পের ক্রেডিট কিন্তু সম্পূর্ণ আমার। আমি নিতান্ত জেদ করেছিলাম ব'লেই এমন একটা অপূর্ব লেখার সৃষ্টি হল। আপ-নার 'বৈজ্ঞানিক' তো কিছুতেই ওরকম জোর ক'রে ধ'রে এনে

আপনাকে চেয়ারে বসাতে পারতেন না। হয়তো তুচার বার 'লিখুন', 'আপনার কিন্তু লেখা উচিত' ব'লেই বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত থেমে যেতেন। বড় জোর সাহিত্যের দিক থেকে আপনার কর্তব্যের দোহাই পাড়তেন, আর আপনি উত্তর করতেন—'পস্টারিটির জন্যে আমার তো ভারি ভাবনা। ঢের সাহিত্য তোমাদের দিয়েছি, এইবার আমার একটু আরাম করবার পালা'—ব্যাস্, হয়ে যেত "অমিট্ রাএ'র" জীবন্তসমাধি। আমি যে আপনার উপর সহজে অত্যাচার করিনে এ কথা আপনাকে মান্‌তেই হবে ; তা না হ'লে নির্ভয়ে আমাকে নিয়ে এতদিন ঘুরে বেড়াতে পারতেন না—তুদিনেই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত। কিন্তু আজকে কেন জানি না মনে হয়েছিলো জেদ না করলেই অন্যায় হবে। প্রমাণ তো হল আমার ধারণাই ঠিক ? নইলে আপনি এই অসুস্থ শরীর নিয়ে নিজে ইচ্ছে ক'রে যখন শুতে চাচ্ছেন—যে শোওয়া নিয়ে আমার সঙ্গে আপনার কত ঝগড়া—তখন আমি আপনার হাত ধ'রে লিখবার টেবিলে টেনে আনি ?" "আচ্ছা, আচ্ছা ; ভারি তোমার বুদ্ধি! সারাদিন কষ্ট ক'রে লিখলুম আমি, আর এখন ক্রেডিট নিচ্ছেন উনি।"

আমাদের সকলের হাসি থামলে আবার বললেন, "সত্যের খাতিরে একথা বলতেই হবে যে তুমি এত জেদ না করলে সত্যিই আমি এ গল্প লিখতুম না। যেমন অনেক গল্প কুঁড়েমি ক'রে হারিয়ে ফেলেছি এটাও তাই করতুম। এখন কিন্তু লিখতে বেশ লাগছে, কারণ, ওদের যে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।"

সেদিন রাত্রেও আর একটা গল্প মুখে মুখে বললেন—এম্‌নি ক'রে চার সন্ধ্যায় চারটে গল্প বলা হল। কিন্তু 'অমিট্ রায়'

ছাড়া আর কোনোটা লিখবার জন্যে ফের আবদার করলাম না। কারণ তখনও 'যোগাযোগ'টা লেখা চলছে। কখনও এটা লেখেন কখনও ওটা। অথচ দুটো একেবারে দু'জগতের— কি ক'রে একই সঙ্গে লেখা দুটো চ'লে ও ভাষা একটুও মিশ খেয়ে যায় না তা ভেবে পাইনে। আশ্চর্য ব্যাপার!

রোজ হয় দুপুরে নয় রাত্রে প'ড়ে শোনাতেন যতটা ক'রে লেখা হত। আমরা উৎসুক হয়ে অপেক্ষা ক'রে থাকতাম 'অমিট্ রায়' ও 'লাবণ্য-র' জন্যে।

কুন্নুরে এই সব কারণে কবির মন বেশ খুশিতে ছিল, কিন্তু আর থাকা চলল না। একদিন সন্ধ্যেবেলা বললেন, "প্রশান্ত, কালই আমার পালাবার ব্যবস্থা করো। আর বেশিদিন এখানে থাকলে ভবিষ্যতে না খেয়ে ম'রে যাব। এখানে ক্রমাগত এত খাবার দেখে দেখে আমার সমস্ত দিন কিরকম গা কেমন করছে। আরো কিছুদিন এরকম চললে জীবনে কোনো জিনিস আর মুখে তুলতে পারব না।"

কুন্নুরে সেদিনকার কথার পরে আবার আমরা গোছগাছ শুরু করলাম। মহারাজ ক্ষুণ্ণ হলেন কবি এত তাড়াতাড়ি চ'লে যাচ্ছেন ব'লে—যদিও আমরা বোধহয় দিন দশেক ছিলাম।

এদিকে সাহেব মাদ্রাজে খবর নিয়ে ইতিমধ্যে জেনেছেন যে একটা ফরাসি জাহাজ দু'চার দিনের মধ্যেই ছাড়বে—কবি সেটাতে ক'রেই অনায়াসে পশ্চিমে পাড়ি দিতে পারবেন।

জাহাজ কলম্বো হয়ে যাবে। কবি অধ্যাপককে বললেন, "প্রশান্ত, রানীর এত বেড়াবার সখ। চলো, তোমরা দুজন আমার সঙ্গে কলম্বো পর্যন্ত না হয় গিয়ে তারপর ওখানে যা যা বেড়াবার আছে, যেমন নিউরেলিয়া, ক্যাণ্ডি ইত্যাদি ঠাণ্ডা

জায়গায় ছুটির বাকি ক'টা দিন কাটিয়ে তারপর ক'লকাতা ফিরে যাবে। এত দূরই যখন তোমরা এসেছ তখন আরো যে ক'টা দিন সঙ্গে থাকা যায় থেকে তারপর আমাকে পশ্চিমে যাত্রা করিয়ে দিও।" আমি তো খুব খুশি আরো বেড়ানো হবে মনে ক'রে—কারণ সিংহলদেশটা তখনও আমার দেখা হয়নি। বিলেত যাবার সময় যদিও কলম্বো থেকেই জাহাজে চড়েছিলাম কিন্তু পৌঁছেছিলাম সেখানে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে, কাজেই শহরটা একটু ঘোরা ছাড়া আর কিছুই দেখিনি। অধ্যাপক কবির কথায় বললেন, "আমাদের তো যেতে আপত্তি নেই কিন্তু আপনার সঙ্গে যাবার জায়গা হবে কিনা সন্দেহ; কারণ এখন গ্রীষ্মের সময় প্রায় প্রত্যেক জাহাজই তো ভর্তি থাকে। তবে মাদ্রাজে খবর নিয়ে দেখি আপনার জাহাজে আর একটা ক্যাবিন খালি আছে কি না।"

কুন্নুর থেকেই টেলিগ্রাম ক'রে জানা গেলো কবির ক্যাবিন ছাড়াও আরও একটা 'ল্যুক্স' (Luxe) ক্যাবিন খালি আছে। এণ্ড্রুজ সাহেব মাদ্রাজ থেকে ট্রেনে কলম্বো পর্যন্ত যাবেন—পথে নাকি তাঁকে কয়েক জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে যেতে হবে; কাজেই আমরা অনায়াসে জাহাজের খালি ক্যাবিনটা দখল ক'রে যেতে পারব কলম্বো পর্যন্ত।

আবার সেই মাদ্রাজ যাত্রা। এমন হিসেব ক'রে কুন্নুর থেকে বেরোনো হল যাতে মাদ্রাজে আর এক রাতও না কাটাতে হয়। গরমের বিভীষিকা তখনও আমাদের মন থেকে ঘোচেনি।

পাহাড় থেকে কবিকে নিয়ে মোটরে নাবাই স্থির হল; এবারে আর এণ্ড্রুজ তাতে আপত্তি করলেন না। তিনি ও

আরিয়াম্ চ'লে গেলেন—অগ্রদূত হয়ে জিনিসপত্র নিয়ে ট্রেনে। আগেই বলেছি কবি বরাবরই ট্রেনের চেয়ে মোটরে চলাই বেশি পছন্দ করতেন, তাই বিদেশেও কত সময় আমরা লম্বা লম্বা পথ ট্রেনের বদলে মোটরেই গিয়েছি।

কুন্নুরে স্যর শঙ্করণ নায়ার কবির সম্বর্ধনায় একটা মস্ত আনন্দ-সম্মিলনের আয়োজন করেছিলেন। কুন্নুরে খুব বেশি লোক না থাকলেও গণ্যমান্য সকলেই সেদিন এসেছিলেন। স্যর অ্যালবিয়ন ব্যানার্জি এবং আরো দু'চারজন বাঙালী যাঁরা ছিলেন সকলেই আগ্রহের সঙ্গে এসে কবিকে ঘিরে বসলেন; খুব খুশি—অপ্রত্যাশিতভাবে কুন্নুরে কবিকে পেয়েছেন ব'লে। সেই পার্টিতেই স্যর শঙ্করণ শুনলেন যে দু'চার দিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ নেবে যেতে ইচ্ছুক। তখনি ছেলের উপর হুকুম হল যেন তাঁর নিজের মোটরে রবীন্দ্রনাথকে নিচে নিয়ে গিয়ে মাদ্রাজের গাড়িতে চড়িয়ে দিয়ে আসা হয়। এই ছেলে কোচিনের রাজকুমারীকে বিয়ে করেছেন।

দু'তিন দিন পরে যেদিন আমরা রওনা হলাম মিঃ পালট তাঁর বাবার প্রকাণ্ড মোটরে খুব যত্ন ক'রেই কবিকে মেটুপালম্ স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিশক্তির কোন বাধা তখনও ঘটেনি; কাজেই নীলগিরি পাহাড়ের নিবিড় সবুজ বন আর তার ভিতর দিয়ে দিয়ে ছায়াঘন রাস্তা—খুব উপভোগ করেছিলেন পথটা। মনে আছে প্রায় যখন পাহাড়তলিতে এসে পৌঁছনো যায় তার একটু আগেই একটা সুপুরি গাছের প্রকাণ্ড বন—মোটরে নামবার সময় উপর থেকে সেটা সুন্দর দেখায়। সুপুরি গাছের শাখাগুলো যেন বড় বড় ফুলের মতো ফুটে

রয়েছে। কবি মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে চেয়ে বললেন, "কী চমৎকার! যেন বড় বড় সবুজ পদ্মফুল—ট্রেনে এলে তো এমন ক'রে দেখতে পেতুম না।"

মেটুপালম্-টা পাহাড়তলির ছোট্টো স্টেশন। বিকেলে পৌঁছলাম যখন তখন ঠিক সূর্যাস্ত হচ্ছে, তার গায়ে দূরে নীলগিরি পাহাড় সত্যিই নীল দেখাচ্ছে। দৃশ্য অতি মনোরম হ'লেও গরমের কষ্টে সেদিকে মন দিতে পারছিলাম না।

স্টেশনের ছোট্টো ওয়েটিং রুমে আমাদের বসিয়ে মিঃ পালট কবির জন্যে স্পেন্সার থেকে কেক্, রুটি, চা প্রভৃতি নিয়ে এলেন। আমরা খাওয়া আরম্ভ করার আগেই তিনি হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য। খাবার নিয়ে খানিকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে আমি যখন তাঁকে ডাকতে গিয়েছি দেখি, তিনি আমাদের জন্যে এত সব আয়োজন ক'রে দিয়ে নিজে প্ল্যাটফর্মে শালপাতায় মোড়া কয়েকটা মাদ্রাজী ফুলুরী ও পিতলের গ্লাসে ক'রে 'ব্রহ্মণ কফি' কিনে খাচ্ছেন। আমাকে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "আমার চায়ের চেয়ে কফি এবং কেকের চেয়ে এইসব খাবারই বেশি ভালো লাগে, তাই আমি বাইরে এসে খাচ্ছি।" কবিকে গিয়ে ব্যাপারটা বলতে তিনি বললেন, "দক্ষিণ ভারতে দেখছি বাইরে লোকে যতই সাহেব সাজুক আসলে তাদের খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি সব বিষয়ে খুবই দেশী ভাবটা বজায় রেখেছে। আমাদের দেশের এই রকম ধনী ঘরের ছেলে যার বাইরে এত পোজিশন সে রিফ্রেশমেণ্ট রুমের খাবার না খেয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে শালপাতার ঠোঙায় ফুলুরী কিনে খাচ্ছে ভাবা শক্ত হত। আমাদের বড্ড বেশি সাহেবিয়ানাতে পেয়ে বসেছে।"

রাত্রে ট্রেনে চ'ড়ে ভোরবেলা মাদ্রাজ পৌঁছনোর মধ্যে

আর উল্লেখযোগ্য ঘটনা কিছু ঘটেনি; শুধু এণ্ড্রুজ সাহেবকে এবারেও অনেকগুলো জরি-দেওয়া কর্পূরের মালা পরতে হয়েছিল।

এবারে আডিয়ারে না গিয়ে স্যর শঙ্করণ নায়ারের জামাই ও মাদ্রাজের D. P. I. মিঃ ক্যাণ্ডেতের বাড়ি ওঠা হল। সাহেব গিয়ে কবির যাত্রার আয়োজন ক'রে এলেন। সেইদিনই বিকেলে জাহাজ ছাড়বে শোনা গেল। কবি জিজ্ঞাসা করলেন, "এবারে ক্যাবিন ইত্যাদি সব ঠিকমতো পাওয়া গিয়েছে তো?" এণ্ড্রুজ উচ্ছ্বসিত হয়ে ব'লে উঠলেন, "Gurudev, you will travel like a prince. এতো ভালো ক্যাবিন তুমি কখনও ছাখোনি।" আমি আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলাম, "স্নানের ঘর?" "হ্যাঁ, সে-সব ঠিক আছে, এবারে আর কিছু ভাবতে হবে না। একেবারে ঘরের সঙ্গে লাগাই সব কিছু পাবেন!"

ক্যাবিন মোটে ছ'খানা খালি পাওয়া গেছে, ছ'খানাই ডে-ল্যুক্স ক্যাবিন, কাজেই খুব নাকি জাঁকজমকের সঙ্গে সাজানো; এবারে আর গুরুদেবের কোনো কষ্ট হবে না। আগেই বলেছি, এণ্ড্রুজ ট্রেনে কলম্বো যাচ্ছেন, সেখান থেকে কবির জাহাজে তাঁর সঙ্গ নেবেন। আমরা ছ'জন নেমে প'ড়ে বাড়িমুখো ফিরে আসবো।

ইতিমধ্যে রথীবাবুর শরীর বেশি খারাপ হওয়াতে প্রতিমাদি তাঁকে নিয়ে আগেই পশ্চিম রওনা হয়ে গেছেন— এণ্ড্রুজ এবং আরিয়াম্‌কে সঙ্গে নিয়ে কবি পরে যাচ্ছেন।

যে জাহাজখানা ঠিক হল তার নাম আমার এখন মনে নেই। তবে ফরাসী জাহাজ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর এটা বেশ

মনে আছে। কাজেই অসম্ভব ভিড়, কারণ মেল জাহাজ নয় ব'লে ভাড়া অপেক্ষাকৃত সস্তা।

জিনিসপত্র নিয়ে সাহেব ও আরিয়াম্ আগেই বাড়ি থেকে রওনা হয়ে গেলেন। আমরা কবিকে নিয়ে সময়ের ঠিক আধ ঘণ্টা আগে জাহাজঘাটে উপস্থিত। অভ্যর্থনা-সম্বর্ধনার পালা শেষ হল, জিনিসপত্র বুঝে নিচ্ছি, খেয়াল গেল স্নানের ঘরটা দেখে নিতে। ইচ্ছে যে, কবি ঘরে ঢোকবার আগেই মুখ ধোবার জিনিসপত্র কাপড়জামা সব ঠিক জায়গায় গুছিয়ে রাখি।

সাহেব আমাকে স্নানের ঘর যেটা দেখিয়ে দিলেন সেখানে ঢুকেই আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল—ঠিক কুনুরের পুনরুক্তি, তবে এবারে অবস্থা আরো শোচনীয়। জায়গাটা স্নানেরও না, কিছুই না, শুধু ক্যাবিনের সংলগ্ন ছোট্টো একটা ফালি ঘর, জাজিম পাতা, দেয়ালের গায়ে কয়েকটা মাত্র পেগ লাগানো আছে কাপড় ঝোলাবার জন্যে। এটা আসলে বাক্স প্যাঁটরা রাখবার জায়গা। তখন জাহাজ ছাড়তে মোটে পাঁচ মিনিট দেরি—সাহেব বললেন, "আর এখন তো কোনো উপায় নেই। তোমরা যা হয় ব্যবস্থা কোরো, আমি চললাম।" বাকি দু'জন পুরুষ সঙ্গীকে ডেকে নিয়ে এলাম। অবস্থা দেখে তাঁরাও হতভম্ব। ব্যবস্থা কী করবো? নিরুপায়ভাবে তিন-জন পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করছি আর ভাবছি, কবি তো কখনো সকালে উঠে সকলের মতো গলিতে কিউ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না—এ সব বিষয়ে যে ওঁর অত্যন্ত সংকোচ। হবে এই, যে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ ঘরে ব'সে থাকবেন সমস্ত দিন। কলম্বো পৌঁছতে চার পাঁচ দিনের

কম লাগবে না, কারণ এটা মেল জাহাজ নয়। এই ক'দিন কী ক'রে কাটবে? করবার আর কী আছে? জাহাজ তো ছেড়ে দিয়েছে—কাজেই যা হবার তা হবেই। এরকম অবস্থায় পড়লে কবি অনেক সময় হাসতে হাসতে একটা বাউল গান গেয়ে উঠতেন—

"মন হরি বলিতে অলস কোরো না রসনা,
যা হবার তাই হবে,
তুখ পেয়েছো না আরো পাবে,
ভবের তরঙ্গ বেড়েছে বলে কি
ঢেউ দেখে না' ডুবাবে?"

গান মনে পড়ল, কিন্তু সঙ্গে হাসি এল না। তিনজন খানিকক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে থাকবার পর চৈতন্য হল যে, দেখা যাক কোন উপায় করা যায় কিনা। আরিয়াম্ ও অধ্যাপক ক্যাপ্টেনকে সমস্যাটা বুঝিয়ে বলাতে তিনি বললেন ঐ ছোট্টো ঘরটাতেই একটা তোলা ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন। বারে বারে যাতে পরিষ্কার ক'রে নিয়ে যায় সে ব্যবস্থাও ক'রে দেবেন। এটা তবু মন্দের ভালো পরামর্শ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিপদ হল কবিকে নিয়েই, তিনি কিছুতেই এত হাঙ্গাম করাতে রাজী নন। ঐ সকলের সামনে দিয়ে ঘর পরিষ্কার ক'রে দিয়ে যাবে, জাহাজের অন্য যাত্রীরা চেয়ে চেয়ে দেখবে—এ কিছুতেই হতে পারে না। কোনো মতেই ওঁকে রাজী করানো গেল না। সেই এক কথা—"তোমাদের যদি চলে তবে আমারও চলবে। যেটা হয়নি সেটা হয়নি; অবস্থাটা মেনে নাও।" তখন তো ওঁর শরীর ইদানীংকার মতো কাবু ছিল না; জেদ ক'রে সব কিছুই করতে পারতেন।

প্রথম দিন ভোরবেলা উঠেই জাহাজের সরু গলি বেয়ে গিয়ে দেখেন দরজা বন্ধ। সেই যে ফিরে এসে কাজে ব'সে গেলেন আর সারাদিনের ভেতরে ওদিক মাড়ালেন না। মহা বিপদ। খাওয়া-দাওয়াও বন্ধ হল। অবশেষে আমরা তিন-জন পরামর্শ করলাম যে কবির আগে আমরা কেউ গিয়ে প্রথম ঘরটা দখল করলে অন্য একজন গিয়ে তাঁকে ডেকে আনবে, এবং তিনি এলে দরজা খুলে বেরিয়ে আসব। এতে তবু খানিকটা সংকট কমানো যাবে। তাই করা হল। তিন-দিন ধ'রে কোন গতিকে জাহাজটা পার ক'রে দিতে পারলে বাঁচা যায়। তারপর কলম্বো পৌঁছলে পরেকার কথা পরে।

অত্যন্ত নোংরা স্টীমার, অসম্ভব ভিড়। গ্রীষ্মকাল, তাই ঘরে কেউ থাকতে চায় না। সারা দিনরাত ধ'রে ডেক্‌টা সকলে মিলে দখল ক'রে ব'সে আছে। কাজেই কবি কোনো সময়ে ঘর থেকে এক পাও বাইরে যেতে চাইতেন না। তবে সৌভাগ্যক্রমে ক্যাবিনটা সত্যিই খুব বড় এবং খোলা; অত্যন্ত আরামের উপযোগী ক'রে সাজানো। উপরের A ডেক্-এর ঘর; বড় বড় জান্‌লাগুলো খুলে রেখে দিলে ঘরের মধ্যে ব'সে ব'সেই দিব্যি সমুদ্র দেখা যায়, কাজেই বাইরে না গিয়েও বেশ চলে। এই ডে-লুক্স ক্যাবিনের জাঁকজমক দেখেই তো আমাদের সাহেবের চোখ ভুলেছিল—অন্য ব্যবস্থার কথা আর মনেই আসেনি। ধ'রেই নিয়েছিলেন যে, আগাগোড়া সবটাই এই জাঁকজমকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবে।

জাহাজের নানারকম অসুবিধার জন্যে কবি সেই কুনুরের না-খাওয়াটাই বজায় রাখলেন। পানীয় তো পারতপক্ষে

খেতে চাইতেন না। অনুযোগ ক'রলে বলতেন, "খেতে আমার গা কেমন করে"—এর উপরে আর কথা নেই।

এই ফরাসী জাহাজের আর একটা কথা না ব'লে পারছিনে; সেই কারণেও কবি বিকেলের আগে ঘর থেকে এক পা বাইরে আসতে চাইতেন না। ইংরেজদের চেয়ে কন্টিনেন্টের লোকেরা জীবনযাত্রাটাকে অনেক সহজ ক'রে নিয়েছে জানি কিন্তু সেটা যে কতটা সহজ তা এই জাহাজে না গেলে কখনো ধারণা করতে পারতাম না। 'পি এ্যাণ্ড ও' অথবা 'ওরিয়েণ্ট' লাইনের জাহাজে দেখেছি—সকাল বেলা ড্রেসিং গাউন না প'রে নিজের ঘর থেকে কেউ বেরোয় না, তাও শুধু স্নানে যাবার সময়। কিন্তু এখন দেখি রাত্রে ডিনারের আগে কেউ রাত-কাপড় ছাড়ে না। শুধু রাত-কাপড় পরা, পায়ে চটি দেওয়া স্ত্রী-পুরুষ সকলেই দিব্যি ডেক্-এ ঘুরে বেড়াচ্ছে, খাবার ঘরে খেতে যাচ্ছে, ব'সে গল্প করছে—একটা ড্রেসিং গাউনেরও বালাই নেই। সকাল থেকে চুল উস্কো-খুস্কো, মুখ হাত ধোয়া নয়, ঐরকম এলোমেলো পোশাক—কী ক'রে যে ওরা সারাদিন ঐ ভাবে কাটাত তা জানিনে। দেখে কবি ভারি বিরক্ত হতেন। অথচ রাত্রে খেতে যাবার আগে সবারই সাজের কী বাহার!

দু'দিন পরেই পণ্ডিচেরী—সেইখানেই প্রথম জাহাজ থামল। কবির শরীর ইতিমধ্যেই নানা অনিয়মে আরো খারাপ হয়ে উঠেছে। তবু শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারলেন না। অরবিন্দ চিঠি লিখে লোক দিয়ে জাহাজে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যে, কবি যেন নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে যান, বহুদিন দেখা হয়নি ব'লে তাঁর কবির

সঙ্গে দেখা ক'রতে ইচ্ছে। বছর দুই আগের থেকেই শ্রীঅরবিন্দ লোকজনের জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন, কারো সঙ্গেই দেখা করেন না; শুধু বছরে কয়টা বিশেষ দিনে নাকি সকলকে একবার ক'রে দর্শন দেন। কিন্তু কবির বেলায় এ-নিয়মের ব্যতিক্রম হল—নিজেই দেখা করবার জন্যে আহ্বান করলেন।

কবি খুশি হয়ে যাবার জন্যে তৈরি; আমরা তিনজনেও ওঁর সঙ্গ নিলাম। এখন সমস্যা—এই রকম অসুস্থ শরীরে জাহাজের মই-সিঁড়ি দিয়ে কী ক'রে কবিকে নৌকোতে নাবানো যায়। জাহাজের কর্তৃপক্ষ একটা মজার পন্থা বের করলেন। প্রকাণ্ড একটা পিপের ভিতর দু'খানা মোড়া পেতে দেওয়া হল—একটাতে কবি অন্যটাতে আমি—ডেক্-এর উপরে পিপেটাকে আনবার পর আমরা দু'জনে গিয়ে মোড়ায় বসামাত্র সেই পিপে ক্রেনের মুখে তুলে নিয়ে আমাদের শূন্যে ঝোলাতে ঝোলাতে সমুদ্রের জলের উপর একটা ছোট্টো ডিঙি নৌকোতে নাবিয়ে দিল। আমরা পিপে শুদ্ধই পার হয়ে ডাঙায় গিয়ে উঠলাম।

যখন ক্রেনের মুখে আমরা শূন্যে ঝুলছি তখন জাহাজে কী অসম্ভব সোরগোল! সব যাত্রীরা রেলিং-এর ধারে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে আর হাসির স্রোত বয়ে চলেছে। ছোট ছেলেরা হৈ হৈ ক'রে চ্যাচাচ্ছে, উৎসাহে হাততালি দিচ্ছে ও মায়ের হাত ধ'রে টানাটানি করছে। ক্রেনে ক'রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শূন্যে ঝুলছেন এ-ছবি কল্পনা করা শক্ত। কবি নিজেও হেসেছিলেন কম নয়—"হাতি, ঘোড়া, গরুকে এমনি ক'রে নাবায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও গরু ঘোড়ার সামিল হয়ে

ক্রেনে ক'রে নাববে এ কি কখনো কেউ ভেবেছিল ?" ব'লে নিজেও যত হাসেন ছেলেরাও তত হাততালি দেয়। বহুদিন জাহাজে একঘেয়ে জীবনের পর সেদিন তাদের সত্যিকারের একটা আনন্দের খোরাক জুটেছিল। এ-দৃশ্যের ফোটো পরে আরিয়াম্ আমাকে দিয়েছিলেন—কে তুলেছিল জানি না।

"অরবিন্দ আশ্রমে" কবি দোতলায় সোজা তাঁর কাছে চ'লে গেলেন, আমরা নিচে সব ঘুরে দেখে বেড়ালাম। শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় একটা ঘরে আমাদের নিয়ে গিয়ে বসালেন—অনেক কথাবার্তা হল। শুনলাম ওখানে কোনোরকম বাঁধা-বাঁধি নেই, যে-যার ইচ্ছে মতো নিজের নিজের কাজ ক'রে যেতে পারে। কেউ সাহিত্যচর্চা করছে, কেউ ছবি আঁকছে ইত্যাদি।

কবি প্রায় ঘণ্টাখানেক শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ক'রে নিচে নেমে এলেন। আশ্রমবাসীরা সবাই কবিকে প্রণাম ক'রে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। দেখলাম খুব বেশি লোক নয়, বোধহয় জন পঁচিশ ত্রিশ হবে। আশ্রমের যিনি "মা" তাঁকেও দেখলাম আসবার সময়; তিনি কবিকে উপর থেকে সঙ্গে ক'রে নিচে নেমে এসে দরজা পর্যন্ত বিদায় দিতে এলেন। পরনে নীলরঙের বেনারসী শাড়ি সোনালী জরির বুটি দেওয়া, অতি আধুনিক প্রথায় প্রসাধন-করা মুখ, চোখে কাজল—না দেখলে মনে মনে ধারণা থেকে যেত যে বাকি লোকজনের মতো তিনিও সাজসজ্জা প্রসাধনের প্রতি বিমুখ ও শুধু-হাত, থানকাপড়-পরা মানুষ।

কবি জাহাজে ফিরে এসে বললেন, "অরবিন্দকে দেখে খুব আশ্চর্য লেগেছে। একেবারে উজ্জ্বল চেহারা—চোখ দুটোর মধ্যে কী আছে, বর্ণনা করা যায় না, এমন আশ্চর্য চোখের

পিপের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ

ভাব। বুঝলুম অন্তরের মধ্যে কিছু একটা পেয়েছেন, তা না হলে চেহারার এরকম দীপ্তি হয় না। বহুদিন পরে ছ্যাখা—খুশি হলুম দেখে।”

এই সাক্ষাৎ এত বেশি মনকে নাড়া দিয়েছিল যে সমস্ত দিন কারো সঙ্গে বড় একটা কথাবার্তা বললেন না। দেখি সারাদিন ধ'রে ব'সে ব'সে কী লিখছেন। যখনই ঘরে যাই তখনই দেখি টেবিলের উপর ঝুঁকে বসে— ; বিকেলে চায়ের আগে লেখাটা শেষ হল। আমাদের প'ড়ে শোনালেন; আর শোনালেন তাঁর সেই স্বদেশীযুগের কবিতা—“অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার”। বললেন, “বহুদিন পরে ছ্যাখা, এবারও ওঁকে নমস্কার জানিয়ে গেলুম।” তাঁর সে-লেখাটা সে-সময়কার প্রবাসীতে ছাপতে পাঠিয়ে দিলেন।

পণ্ডিচেরীর পর কলম্বো পৌঁছতে বোধহয় একদিন লাগল। পরদিন বিকেলবেলা জাহাজঘাট লোকে লোকারণ্য—শহরসুদ্ধ ভেঙে পড়েছে বিশ্বকবির আগমন সংবাদে। মালা-চন্দন, কর্পূর কিছুই বাদ পড়েনি। সমস্ত জনতার সামনে জগদ্বিখ্যাত দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কবির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে—দুই বগলে দুই বালিশ। দূর থেকে এই দৃশ্য দেখে রবীন্দ্রনাথ ও আমরা তিনজন হেসে আর বাঁচিনে। কবি হাসেন আর বলেন, “একেবারে পাগল!”

এই বালিশের একটু ইতিহাস আছে। সাহেবের ছেলেমানুষির এই গল্পটাও মজার। এণ্ড্রুজ সাহেবকে পুরো দেখতে পাওয়া যায় না তাঁর ভিতরকার এই পাগল শিশুটিকে না দেখলে। এই ঘটনাগুলির ভিতর দিয়ে তাঁর যে রূপটি ফুটে ওঠে তাইতেই বোঝা সহজ হয় যে, রবীন্দ্রনাথের কেন

তাঁর প্রতি এত বিশেষ মমতা ছিল। কবি অনেক সময়েই খুব স্নেহের সঙ্গে "ও আমার এক আচ্ছা পাগল" ব'লে সাহেবকে উল্লেখ করতেন, আর বলতেন, "পাগল না হ'লে কখনো এমন ক'রে ভালোবাসতে জানে? ও আমাকে এত ভালোবাসে যে দরকার হ'লে আমার জন্যে বোধহয় প্রাণও দিতে পারে। ভিতরে একটা শিশু না থাকলে এরকম হওয়া যায় না।"

এইবার বালিশের গল্পটুকু বলি। আমরা যখন মাদ্রাজ থেকে রওনা হই সাহেব ভয়ে ভয়ে এসে বললেন, "রানী, ট্রেনে ব্যবহারের জন্যে দু'টো বালিশ দিতে পারো? কলম্বো পৌঁছে তোমাকে ফিরিয়ে দেব।" আমি সাহেবের স্বভাব জানি। ওঁর নিজের জিনিস কিছুই রক্ষা করার ক্ষমতা নেই। অন্য-লোকের জিনিস দরকারের সময় নিঃসংকোচে উঠিয়ে নিয়ে আসতে পারেন, আবার অন্যের প্রয়োজনে নিজের যথাসর্বস্ব খুশি মনে বিলিয়ে দিতেও জানেন। কতবার আলিপুরে আমাদের বাড়িতে থেকেছেন। বিদেশে যাবার সময় দরকার মতো সোডার বাস্কেট, খাবার সাজিয়ে বেতের বাক্স সঙ্গে দিয়েছি, কিন্তু কখনো সে-সব জিনিস ফিরে আসেনি। এসে হাসিমুখে বলেছেন, "রানী, সব হারিয়ে ফেলেছি।" আমরা জানতাম উনি ঐরকমই পাগল, কাজেই যখন যা দিয়েছি তা আর ফিরে পাবার আশা রাখিনি। কবিও এই নিয়ে সাহেবকে খুব ঠাট্টা করতেন। একবার কোথা থেকে ফিরে এসে কবিকে খুব চমৎকার একটা রেশমী চাদর দিয়ে বললেন, "Gurudev, here is a lovely present for you." গুরুদেব সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলেন, "From where have

you stolen it ?" সাহেব হো হো ক'রে হেসে উঠে বললেন, "সত্যিই তুমি ধরেছ। আমি যে কোথা থেকে এটা সংগ্রহ করেছি কিছুতেই মনে করতে পারছি না, তাইতো ভাবলাম তোমাকে দিই, আমার দোষ কেটে যাবে।" আমাদের উপস্থিত সকলের একটা হাসির খোরাক জুটল।

কুন্নুরে বিছানা-বিভ্রাটের পর সাহেব আমার কাছে একটু অপ্রস্তুত হয়েই ছিলেন, তাই পাছে আবার একটা অসুবিধা করেন মনে ক'রে ভয়ে ভয়ে বালিশ চাইলেন। আমিও মজা ক'রে বললাম, "হ্যাঁ, বালিশ দিতে পারি কিন্তু আপনাকে কথা দিতে হবে যে, আপনি আমার অন্যান্য জিনিসের মতো এ দু'টো জিনিসও হারাবেন না! কারণ আপনার বিলেত চ'লে যাবার পর আমরা যখন ক'লকাতামুখী হব তখন ট্রেনের লম্বা পথে বালিশ না থাকলে কষ্ট হবে।" সাহেব তৎক্ষণাৎ স্বীকার করেন যে কিছুতেই এবারে বালিশ হারাবেন না। সেই মাদ্রাজের পর এই প্রথম কলম্বোর জাহাজঘাটে আমাদের দেখা। আমাকে দেখামাত্র বললেন, "রানী, এই নাও তোমার বালিশ। বাবাঃ! এ ক'দিন যে আমার কী ভয়ে ভয়ে কেটেছে, পাছে হারিয়ে ফেলি। কথা দিয়ে অবধি আতঙ্কে অস্থির হয়ে আছি পাছে কথা না রাখতে পারি। মাদ্রাজ ছেড়ে অবধি যখন যেখানে গিয়েছি একমুহূর্তও বালিশ দু'টো হাতছাড়া করিনি। গুরুদেব, এখন আমার ছুটি। Prasanta, I am mortally afraid of Rani. She is a tyrant. Now you have witnessed, I have kept my promise. Oh! today I am free. You will never be able to imagine how I passed these last

few days. Wherever I went I carried these pillows so that I may not lose them." আমাদের তো হাসি আর কিছুতেই থামে না। কবি হাসতে হাসতে আমাকে বললেন, "রানী, তোমার একি অন্যায়? না হয় আর দু'টো বালিশ বাজার থেকে কিনেই নিতে। অনর্থক বেচারাকে এরকম কষ্ট দেওয়া কেন? এই বোধহয় জীবনে ও প্রথম কোনো জিনিস রক্ষে করতে পেরেছে—বেচারা এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সেই কুমুরের বিছানার পর থেকে সাহেব তোমার সম্বন্ধে কী সাবধানেই না চলছে। কিন্তু এটা তোমার ওর ওপর খুব অত্যাচার—ওর কাছ থেকে কথা নিয়েছ যে ও বালিস হারাবে না। তোমাকে খুব ভয় না পেলে ও একথা রাখতে পারত না।" কবি এই সব কথা বলছেন আর কেবলি হেসে উঠছেন। সাহেবের দিকে ফিরে বললেন, "Andrews, you are right. She is a tyrant, otherwise knowing you she would not have extracted such a cruel promise like this."

বালিশ দু'টোর ওয়াড় সাহেবের হাতে হাতে একেবারে কালো হয়ে গিয়েছে। অত গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে এণ্ড্রুজ কবিকে অভ্যর্থনা করতে এসেছেন—বগলে দুই বালিশ। কী অপরূপ দৃশ্য!

বহুদিন পরে, প্রায় পাঁচবছর হবে, সাহেবের সঙ্গে শান্তি-নিকেতনে আমার দেখা। দেখেই প্রথম কথা, "Rani, do you remember those pillows?" আর সঙ্গে সঙ্গে সেই শিশুর মতো হা হা ক'রে হাসি। আমার সঙ্গে মিঃ এণ্ড্রুজের এইরকম সম্বন্ধই ছিল—তাই তাঁর এই চেহারাটাই

আমার মনে বেশি উজ্জ্বল হয়ে রইল। এইসঙ্গে সাহেবের আরো একটা চেহারা মনে ছবির মতো ব'সে গেছে—যেদিন মৃত্যুশয্যায় তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। কবি যে বলতেন, "এণ্ড্রুজ যে আমাকে ভালোবাসে সে ভালোবাসার তুলনা নেই", সে-কথা যে কতো সত্যি সেদিন তা বুঝেছিলাম। মৃত্যুর ঠিক দু'দিন আগে হাসপাতালে তাঁকে দেখতে গিয়েছি। দেখি যন্ত্রণায় মুখ প্রায় নীল হয়ে গিয়েছে, তবু আমাকে দেখেই হাত বাড়িয়ে দিয়ে শক্ত ক'রে হাতখানা ধ'রে বললেন, "Rani, tell me how is Gurudev. Ask him not to worry about me. Please go and stay with him and give this message of mine that I am all right." যন্ত্রণায় আর বেশি কথা মুখ দিয়ে বেরোল না, নার্স আমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে ইসারা করল। দেখে অবাক হলাম যে মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যেও সাহেব তাঁর গুরুদেবের কথাই ভাবছেন —তাঁর কিরকম কষ্ট হবে সেই ভাবনাটাই তাঁকে উতলা করেছে। তাই আমাকে অনুরোধ কবির কাছে গিয়ে কয়েকদিন থাকতে। সেদিন অত কষ্টের মধ্যেও আমাদের দেখে তাঁর মুখে হাসি ফুটেছিল, কিন্তু সেই প্রাণখোলা হাসি আর নেই।

যা'হোক, অত অসুবিধা সহ্য ক'রে ঐ জাহাজে আরো কুড়িদিন থাকা চলবে না ব'লে কবি অন্য জাহাজের আশায় কলম্বোতে নেবে পড়লেন। জাহাজের অত্যাচারে তাঁর শরীর আরো বেশি খারাপ হয়ে উঠেছে, বেজায় পা ফুলছে, এইসব কারণে কলম্বোর ডাক্তাররা সপ্তাহখানেক বিশ্রাম ক'রে যাবার উপদেশ দিলেন। সাহেব বললেন ইতিমধ্যে তিনি স্টীমারেরও বন্দোবস্ত ক'রে নিতে পারেন।

কলম্বোর খুব ধনী লোক মিঃ ডি'সিল্‌ভার বাড়িতে কবি আতিথ্য গ্রহণ করেছেন; সুবিধা, আরাম, কোনো আয়োজনেরই ত্রুটি নেই; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বেশি অসুস্থ বোধ করায় মিঃ ডি'সিল্‌ভা একজন খুব বড় ডাক্তার ডেকে নিয়ে এলেন। তিনি রুগীকে পরীক্ষা ক'রে বললেন, "এরকম শরীর নিয়ে এত দূরের পথ পাড়ি দেওয়া আমি সঙ্গত মনে করি না। এই অবস্থায় রওনা হয়ে তারপর হঠাৎ জাহাজের মধ্যে যদি বেশি বাড়াবাড়ি হয় তখন কী উপায় হবে? আমার মতে এখন বিলেত না যাওয়াই ভালো।" কবি নিজেও ডাক্তারের মতের বিরুদ্ধে যেতে ভরসা পেলেন না। দিন কয়েক পরে এণ্ড্রুজ একাই পশ্চিমে যাত্রা করলেন, আমরা রেলপথে ভারতবর্ষের দিকে ফিরলাম।

কলম্বোতে থাকতে থাকতেই বৈশাখী পূর্ণিমা এল। ডি'সিল্‌ভারা বৌদ্ধ—তাঁরা প্রতি বছর ঐ দিনে অনুরাধাপুরের অশ্বত্থচৈত্যে অর্ঘ্য দিতে যান। কলম্বো থেকে অনুরাধাপুর সম্ভবত একশ' মাইল হবে। ডি'সিল্‌ভারা নিজেদের মোটরে যাচ্ছিলেন, আমাদের দু'জনকেও সঙ্গে নিতে চাইলেন। তখনও এণ্ড্রুজ ছিলেন, কাজেই কবির জন্যে কোনো ভাবনা নেই। এমন সুযোগ পাব না ব'লে কবি নিজেই আগ্রহ ক'রে আমাদের পাঠিয়ে দিলেন। আরিয়াম্‌ কলম্বোতে নিজের এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছিলেন। তা ছাড়া তিনি সিংহলেরই বাসিন্দা—তাই সবই দেখা আছে; কাজেই আরিয়াম্‌ এবং সাহেবকে কবির কাছে রেখে আমরা চ'লে গেলাম।

অনুরাধাপুরে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন যদি কেউ গিয়ে থাকে

তবে সেই বুঝবে, সে কী দৃশ্য। আমার যেটা সব চেয়ে আশ্চর্য লেগেছিল সে হচ্ছে সমস্ত যাত্রীদের নিজেদের ভেতরকার শৃংখলা।

পঞ্চাশ হাজার লোক একজায়গায় এসে মিলেছে কিন্তু কোথাও গোলমাল নেই। ভেঁপু বাজছে না, ছেলে কাঁদছে না, মারামারি হচ্ছে না, রাস্তার মোড়ে মোড়ে কোথাও পুলিশ নেই, অথচ পথঘাট লোকে লোকারণ্য। এই জনারণ্যে আর কোনো আওয়াজ নেই, শুধু অত লোকের মুখের মন্ত্রোচ্চারণ-ধ্বনি সমস্ত আকাশ বাতাস যেন ভ'রে রেখেছে। সর্বদাই গুন্ গুন্ একটানা একটা শব্দ কানে আসছে গানের মতো। কত দূরদূরান্তর থেকে যাত্রীরা আসছে মোটরবাসে ক'রে, কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না, শুধু মন্ত্রোচ্চারণ করছে গাড়িতে ব'সে। সকলেরই চাপা গলা, পাছে বেশি গোলমাল হয়।

অশ্বত্থতলায় উঁচু ক'রে বেদী বাঁধানো, ব্যস্ আর কিছু নেই। এই অশ্বত্থগাছই নাকি সঙ্ঘমিত্রা ভারতবর্ষ থেকে বহন ক'রে নিয়ে গিয়ে সিংহলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বুদ্ধের জন্মতিথিতে অনুরাধাপুরের সেই গাছের নিচেই লোকে পূজা নিবেদন ক'রে যায়। অশ্বত্থচৈত্যের বেদীমূলে ওঠবার এবং নামবার দু'টো সিঁড়ি। বেদীর চারপাশটা রেলিং দিয়ে ঘেরা—যাত্রীরা ওঠবার সিঁড়ি দিয়ে এসে বেদী প্রদক্ষিণ ক'রে সুপুরির খোলাতে সাজানো ধূপ প্রদীপ ও সুপুরির মঞ্জরী অর্ঘ্য দিয়ে নেমে যাচ্ছে। এখানে ধনী দরিদ্রের ভেদ নেই, আগে যাবার জন্যে ঠেলাঠেলি নেই—সবাই সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, যে আগে এসেছে সে আগে উঠবে; সহিষ্ণুভাবে সবাই অপেক্ষা করছে। এরকম নিয়মানুবর্তিতা আমাদের দেশে কোনো

ভিড়ের মধ্যে দেখি না কেন? বেদীমূলে কোনো পুরোহিত পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে নেই—প্রত্যেকেই আপনার অর্ঘ্য আপনিই নিবেদন করছে। এ দৃশ্য না দেখলে একটা বড় জিনিস দেখা হ'ত না। অনুরাধাপুরের কথা অনেক সময় আমার মনে পড়ে, আর অবাক হয়ে ভাবি যে, পঞ্চাশ হাজার লোকের ভিড়ের মধ্যে কোথাও পুলিস দেখিনি।

অশ্বত্থচৈত্যে যাবার রাস্তার দু'ধারে সুপুরির খোলায় সাজানো অর্ঘ্য বিক্রি হচ্ছে। দোকানেও ধূপ প্রদীপ আলাদা ক'রে কিনতে পাওয়া যায়, যারা একটু বেশি প্রদীপ ও ধূপ দিতে চায় তারা আলাদা ক'রে কিনে নিতে পারে। দোকানীরা নিস্তব্ধভাবে নিজের পশরা নিয়ে ব'সে আছে, কেউ কাউকে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি ক'রে জিনিস কিনতে বলছে না। যার যা খুশিমতো নিজেরাই কিনে নিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত আবহাওয়াটাই এমন সুন্দর ও গম্ভীর যে মনকে আপনিই প্রগল্‌ভতা থেকে ফিরিয়ে আনে। পূজোর জায়গা তো এইরকমই হওয়া উচিত, যেখানে গেলে সহজে মাথা নত হবে, মন পূজানিবেদনের যোগ্য হবে।

আমাদের দেশের অনেক তীর্থের জায়গায় ঘুরেছি কিন্তু আকাশে বাতাসে এরকম গাম্ভীর্য কোথাও নজরে পড়েনি। সেখানে পাণ্ডার টানাটানি, ভিখিরির কচকচি, ধরমশালার ব্যাবসাদারী, এ-সবে মিলে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে—তীর্থের আসল চেহারাটাকে এরা ঘুলিয়ে দিয়েছে। সেইজন্যেই অনুরাধাপুরের এই নতুন আবহাওয়া আমার মনকে এত টেনেছিল—এখনও থেকে থেকে ইচ্ছে হয় আবার যাই।

অনুরাধাপুরের অশ্বত্থচৈত্য ছাড়াও আর একটা প্রকাণ্ড

স্তূপে অর্ঘ্য নিবেদনের জায়গা। যাত্রীরা প্রথমে বেদীমূলে পূজা দিয়ে তারপর সেখানেই যায়। স্তূপটা আগাগোড়া আলোর মালা দিয়ে সাজানো—কত সহস্র প্রদীপ লেগেছে কে জানে! অনির্বচনীয়! বৈশাখী পূর্ণিমার ঝক্‌ঝকে জ্যোৎস্না রাত, চারিদিকে একটানা গম্ভীর সুর, সামনে প্রদীপের মালা—মনে হল যেন কোন্ এক স্বপ্নরাজ্যে এসে পড়েছি; যেন বাস্তব জগতের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। দুঃখ হতে লাগল কবি দেখলেন না ব'লে।

পরদিন সকালে আবার কলম্বো ফিরে এলাম—মোটরে একশ' মাইল কতক্ষণই বা লাগে? ফিরে এসে কবির কাছে সব গল্প করাতে তিনি খুব খুশি হলেন। অনেক জায়গাতেই যেখানে উনি নিজে যেতে পারতেন না সেখান থেকে ফিরে এলে আমাদের মুখে খুঁটিয়ে সব কথা শুনতে ভালোবাসতেন। অনুরাধাপুর ওঁর মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করত জানি ব'লেই সারাপথ অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলাম, কতক্ষণে গিয়ে গল্প করব। কবি সব শুনে বললেন, "আমাদের দেশের তীর্থগুলো পাণ্ডারা মিলে নষ্ট করছে। বুদ্ধের যারা উপাসক তাদের মনে তিনি আপন গাম্ভীর্যের স্পর্শ লাগিয়েছেন, তাই অনুরাধাপুরে এমন সুন্দর জিনিসটি দেখতে পেলে।"

কবিকে আরো দু'দিন মিঃ এণ্ড্রুজের ও আরিয়ামের কাছে রেখে আমরা ডাম্বালা, সিগিরিয়া, কাণ্ডি প্রভৃতি সব দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো দেখে এলাম।

ডাম্বালা, সিগিরিয়া প্রভৃতির ফ্রেস্কো একটা দেখবার জিনিস। কোথায় কোন্ ঘন জঙ্গলের মধ্যে পাথর কেটে মানুষ গুহা বানিয়েছে—তার মধ্যে মন্দির তৈরি ক'রে তার গায়ে

ফ্রেস্কো এঁকেছে। কতদিনের লুপ্ত ইতিহাস তার পিছনে। যেসব শিল্পীর সারাজীবনের সাধনা আমরা দেখতে পেলাম তাদের নামও কেউ জানে না, তাদের কোনো চিহ্নই কোথাও পড়ে নেই, শুধু তাদের হাতের কাজ আজও সাক্ষ্য দিচ্ছে তাদের সংস্কৃতির। সে-যুগের এমনতরো আরো কত ইতিহাস মানবসভ্যতা থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে যা দেখলে সবাই বিস্মিত হত।

সিগিরিয়া ফ্রেস্কোর একটা ছবি আমার মনের উপর এমন মায়াজাল বিস্তার করেছিল যে আজও সেই মেয়েটির মুখ স্পষ্ট মনে আছে। পাহাড়ের এত উঁচু জায়গায় ছবি আঁকা যে নীচে থেকে ভালো ক'রে দেখা যায় না ব'লে লোহার একটা মই-সিঁড়ির ব্যবস্থা আছে, যাতে লোকেরা যতটা সম্ভব উপরে উঠে ছবিগুলি দেখতে পায়। বাইরের রোদবৃষ্টিতে অনেক ছবিই ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে কিন্তু একটি মেয়ে হাতে একটা আয়না নিয়ে ব'সে আছে—এই ছবিটা একেবারে জ্বলজ্বল করছে। তার গায়ের রঙে হলদের আভাস না দিয়ে হাল্কা সবুজ করা হয়েছে—একেবারে যেন নবদূর্বাদলশ্যাম! বেশ ছিপ্‌ছিপে দেখতে, গলাটা অনেকখানি লম্বা, ঘাড়ের কাছে এলোচুলের খোঁপাটা নেমে এসেছে, চোখে মুখে সে যে কী অপূর্ব লাবণ্য, আজও ভুলতে পারিনি।

ডাম্বালা, সিগিরিয়া প্রভৃতি যাবার রাস্তাটাও চমৎকার। ক্যাণ্ডি থেকে ঠিক কত দূর মনে নেই, তবে অনেকখানি পথ তা বেশ মনে আছে।

আমরা ভোরে ট্যাক্সি ক'রে বেরিয়ে সন্ধ্যেবেলা ক্যাণ্ডি ফিরে এলাম। ড্রাইভারটি বেশ ভালো পেয়েছিলাম—

আমাদের খুব যত্ন ক'রে যেখানে যা দেখবার আছে সব দেখিয়ে দিলে।

ঘন বনের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে পথ চ'লে গেছে—মোটরে যেতে চমৎকার লেগেছিল। য়ুরোপে সর্বত্র যেখানে যা দেখার আছে যখন দেখে বেড়াতাম কবি কত সময় আমাকে ঠাট্টা ক'রে বলতেন, "কী উৎসাহ বেড়াবার। তোমার চোখের তৃষ্ণা কি কখনো মিটবে না? আসলে বিধাতা কল্পনাশক্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন কিনা, তাই চোখে দেখবার জন্যে ছুটে বেড়াতে হয়। পেতে আমার মতো ভাগ্য তাহলে অনেক পরিশ্রম বেঁচে যেতো—এক জায়গায় ব'সেই সব কিছু দেখতে পেতে।" কথাটা ঠাট্টা ক'রে বলা হলেও খুবই সত্যি কথা। আর্টিস্টের চোখ যদি হত তাহলে নিজেদের চতুর্দিককার পরিবেশের মধ্যেই এত সৌন্দর্য দেখতে পেতাম যে নানা জায়গায় ছুটে বেড়াবার দরকার হ'ত না। শুনেছি অবনীন্দ্রনাথ কখনো নাকি আগ্রা যাননি; কিন্তু ওঁর "সাজাহানের মৃত্যু" ছবিখানা দেখলে কি কেউ বুঝতে পারবে উনি সত্যি তাজমহল চোখে দেখেননি? শুনেছি অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আমার মনের মধ্যে তাজমহলের যে ছবিখানি সঞ্চিত আছে আসলটি দেখতে গেলে পাছে সেটি নষ্ট হয়ে যায় সেই ভয়ে আমি তাজ দেখতে চাইনি।" ওই "সাজাহানের মৃত্যু" ছবিখানাতে উনি প্রমাণ করেছেন ওঁর আসল তাজমহল দেখবার দরকার নেই।

ক্যাণ্ডি থেকে ফিরে এসে কবির কাছে দুঃখ করলাম উনি ডাম্বালা দেখতে পেলেন না ব'লে—বললেন, "এই তো তোমাদের চোখ দিয়েই দেখতে পাচ্ছি, শুনতে শুনতে সমস্ত

'অ্যাট্‌মস্‌ফিয়ারটা' আমার মাথার মধ্যে জ'মে উঠেছে। হয়তো কোনোদিন দেখবে আমার অগোচরেই কোনো গল্প বা কবিতার মধ্যে সমস্ত ছবিটা বেরিয়ে এসেছে। এমনি ক'রেই আমরা দেখি। তোমার মতো আমাকে ছুটে বেড়াতে হয় না।" আমি বললাম, "জীবনে এত জায়গায় বেড়িয়েছি তবু কেন আমার বেড়াবার নেশা ঘুচল না।"

"সে তো আমি খুবই জানি। তাই জন্যেই তো বললুম যে এখানে যা দেখবার আছে সব কিছুই দেখে নাও। কেমন? যেতে ব'লে ভালো করিনি? কিন্তু এইবার একটা বোঝাপড়া আছে। আচ্ছা, আমাকে ফেলে রেখে তো তোমরা বেড়িয়ে এলে, এখন আমার জন্যে কী এনেছ সেখান থেকে বের করো।" ভেবেছিলেন অপ্রস্তুত ক'রে দেবেন। বলামাত্র তৎক্ষণাৎ আমি আমার হাতব্যাগ থেকে ক্যাণ্ডির তৈরি একটা লম্বাটে তামার বাক্স, রূপোর তারের কাজ করা, বের ক'রে ওঁর হাতে দিলাম। কৌটোটাতে কবির কলম-পেন্সিল রাখবার বেশ সুবিধা হবে মনে ক'রেই এটা নিয়েছিলাম, কারণ প্রত্যেকবার লেখবার বাক্সের মধ্যে ওঁকে কলম ও পেন্সিল হাতড়াতে যখন দেখতাম মনে হ'ত এই রকম একটা লম্বা কৌটো পেলে বড় সুবিধা হয়।

জিনিসটা হাতে নিয়েই খুব হেসে বললেন, "আরে, এযে সত্যিই একটা ভালো জিনিস এনেছ আমার জন্যে। আমি ভেবেছিলুম হঠাৎ কিছু চেয়ে ঠকিয়ে দেব, কিন্তু এ যে দেখছি আমাকেই ঠকালে! না না, এত সুন্দর জিনিসটা তুমিই রাখো, কী হবে আমার এসব দিয়ে?" বললাম, "সে কী ক'রে হতে পারে; আপনার কথা মনে ক'রেই যে কিনেছি।

প্রত্যেকবার বাক্স গোছাবার সময় ছুরি কলম পেন্সিলগুলো বেজায় গোলমাল করে। সব ক'টাকে একত্রে ধ'রে রাখবার এই একটা উপায় বের করা গেছে; কিন্তু একটা শর্ত আছে।"

"সর্বনাশ! শেষকালে কি এণ্ড্রুজের মতো আমাকেও বিপদে ফেলবে নাকি? যদিও ভয় হচ্ছে, তবু বলো; শুনি কী শর্ত।"

"আপনি সব জিনিসই যেমন দু'দিন পরে যাকে তাকে বিলিয়ে দেন এই কৌটোটি সম্বন্ধে তা করতে পারবেন না। হারিয়ে ফেললে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু কাউকে দিলে চলবে না। কারণ এরকম একটা জিনিস লেখবার বাক্সে না থাকলে সত্যিই ভারি অসুবিধা হয়।"

"হ্যাঁ, এ অতি উত্তম প্রস্তাব। এ শর্তে আমি রাজী আছি, কারণ এটার অভাব আমিও অনুভব করেছি, কাজেই নিশ্চয়ই কাউকে দেব না।"

এণ্ড্রুজের মতো কবিও কথা রেখেছিলেন। প্রত্যেকবার আমাদের বাড়িতে যখন আসতেন বাক্স থেকে কলম বের করবার সময় বলতেন, "এই দ্যাখো, এখনও কাউকে দিইনি। আমার উপরে তোমার কী অবিশ্বাস।"

কলম্বোতে কবির শরীর খুবই অসুস্থ চলছিল ব'লে বাইরে কোথাও এনগেজ্‌মেন্ট নেনান, তাই সারাদিন বাড়ি ব'সে ব'সে "যোগাযোগ" ও "শেষের কবিতা" (তখন গল্পটাকে 'মিতা' ব'লে উল্লেখ করতেন) লেখা চলছিল। তবে কলম্বোতে কেন জানি না "যোগাযোগ"টাই বেশি লেখা হয়েছিল। শরীর অসুস্থ হ'লেও লেখা দু'টো নিয়ে সর্বদাই মন এমন খুশি ছিল

যে সারাদিন হাসিতে কৌতুকে আমাদের সকলকে ভরিয়ে রেখেছিলেন।

কলম্বোর একজন ধনী ভদ্রলোক সেই সময় মিঃ আরিয়ামের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে উঠে প'ড়ে লেগেছেন, কিন্তু আরিয়াম্ কিছুতেই রাজী নন। মেয়ের বাবা একদিন বিকেলে কবির কাছে তাঁর মেয়েটিকে নিয়েও এলেন দেখাতে, যদি কবি আরিয়ামের মত করাতে পারেন। শোনা গেলো ভদ্রলোক অনেক টাকা যৌতুক দিতে রাজী; পঞ্চাশ হাজার কি এক লক্ষ, ঠিক মনে নেই, এই রকম হবে। মেয়েটি দেখতে কালো-কোলো, ছেলেমানুষ, একখানা গোলাপী রংএর শাড়ি প'রে এসেছিল তাও মনে আছে, আর আপাদ-মস্তক হীরের গহনায় মোড়া। কন্যার বাবা যে এক লক্ষ টাকা দিতে পারেন তা তাঁর মেয়ের সাজ দিয়েই তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। আরিয়াম্ তো সেদিন বিকেলবেলা পালিয়ে বেড়ালেন। কবির তাতে খুব মজা লেগেছিল। পরে যখন তখন আরিয়াম্‌কে বলতেন, "ওহে, এখনো ভেবে দ্যাখো। এক লক্ষ টাকা সোজা নয়। এত ভয় কিসের? আর মেয়েটিকে দেখে শুনে তো ভয়ঙ্কর ব'লে মনে হল না। বুঝেছ? এখান থেকে যাবার আগেই একটা ঠিক ক'রে ফেল। না হয় তুমি টাকাটা নাই নিলে, আমাকে দিয়ে দিলে আমি খুশি হয়েই নেব।" আরিয়াম্ যখন হেসে উঠতেন ওঁর কথা শুনে তখন কবি খুব দুঃখের ভান ক'রে বলতেন, "হায়রে, আমাকে কেউ এক লাখ টাকা আর মেয়ে নিয়ে সাধে না। এ তো প্রায় অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা বললেই হয়। আমি পেলে বিশ্বভারতীর আর কী ভাবনা ছিল?"

কবির আচমকা কৌতুক করার স্বভাব তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত সকলেরই জানা আছে। তবু কোনো গল্প মনে প'ড়ে গেলে বলতে ইচ্ছে করে। এমন গম্ভীরভাবে হঠাৎ কিছু ব'লে উঠতেন যেটা মন মোটেই প্রত্যাশা করেনি ; তাতে ক'রে আরো বেশি হাসিয়ে দিতেন।

একদিন কলম্বোতে বাজারে বেরিয়ে ছোট, বড়ো, মাঝারি নানা আকারের চোদ্দ পোনেরোটা আবলুশ কাঠের হাতি কিনে এনেছি। হাতিগুলো ঘরে টেবিলের উপর সার ক'রে সাজিয়ে দেখছি এমন সময়ে কবি হঠাৎ ঘরে ঢুকে আমার হাতির মিছিল দেখে বললেন, "ও কি ও, অতগুলো হাতি কী হবে ?" আমি যেই উত্তর করেছি, "আপনার সায়েন্টিস্ট হাতি বেজায় ভালোবাসেন, তাই কিনে এনেছেন" অমনি তৎক্ষণাৎ ব'লে উঠলেন, "এতদিনে বুঝতে পারলাম প্রশান্তর তোমাকে কেন পছন্দ।" আমরা হো হো ক'রে ঘর সুদ্ধ হেসে হেসে অস্থির। মোটেই কেউ আন্দাজ করতে পারিনি কী উত্তর দেবেন। নিজেও খুব খানিকটা হেসে আমার হাসি দেখে বললেন, "যা মুখে আসে তাই ব'লে বসি, আর তুমি তাইতে হাসো ? কিছু যদি আত্মসম্মান বোধ থাকে তোমার।" কতদিনের এইরকম কত ছোটোখাটো ঘটনা মনে পড়ে।

এইবার আমাদের ফেরবার পালা। কলম্বো থেকে রওনা হয়ে প্রথম মাদুরায় দু'দিন বিশ্রাম। অসুস্থ শরীরে কবি লম্বা পথ একটানা যেতে পারবেন না ব'লে এই ব্যবস্থা হ'ল। মাদুরার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার গোপাল মেননের বাড়ি আমরা উঠলাম। ইনি কে, পি, এল্, মেননের দাদা। তাঁরা পরিবার

সুদ্ধ সবাই তখন হাওয়াবদল করতে গিয়েছেন। তাঁর একটি অল্পবয়সী ছেলে ও চাকর-বাকর ছিল। মিঃ মেনন্ টেলিগ্রাম ক'রে জানালেন যে তাঁর বাড়িতে কবি দু'দিন বিশ্রাম ক'রে গেলে তিনি কৃতজ্ঞ হবেন। তিনি কোনো একটা বিশেষ কারণে নিজে না আসতে পারায় ছেলেকে পাঠিয়েছেন কবির অভ্যর্থনার জন্যে।

মাদুরাতে তখন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন শিক্ষক, (পরে ক'লকাতা কর্পোরেশনের বড় কর্মচারী) শ্রীযুক্ত বঙ্কিম রায় ছিলেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত খুশি কবিকে বহুদিন পরে দেখতে পেয়ে। রবীন্দ্রনাথের শরীর তখন মোটেই ভালো না—সমস্তদিনই শুয়ে কাটলো। তবু সন্ধ্যেবেলা ওখানকার নামকরা একজন ওস্তাদ কবি এসেছেন খবর পেয়ে তাঁকে নিজের গান শুনিয়ে গেলেন। ওস্তাদটি চ'লে গেলে কবি বললেন, "খুব ওস্তাদ বটে, খুবই কঠিন সাধনা করতে হয়েছে, তবু গলায় গান নেই, কেবলি গলার জিম্‌নাস্টিক ভালো লাগে না।"

পরদিন আবার বোট মেলে মাদুরা থেকে যাত্রা। কবি স্টেশন থেকে বাড়ি গিয়েছিলেন, আবার বাড়ি থেকে স্টেশনে। মাদুরা আমাদের আগেও দেখা ছিল। তবু একফাঁকে মন্দির বেড়িয়ে আসবার লোভ সামলাতে পারলাম না, যদিও স্বীকার করছি উত্তর ভারতের মোগলবাদশাহের রুচিটাই আমার বেশি পছন্দ। দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য আমার চোখে ভালো লাগে না ; এতো জবড়জঙ্গ যে মনের উপর বড্ড যেন বেশি ভার চাপায়। সমস্ত জড়িয়ে দেখলে মন্দিরগুলো আমার সুন্দর লাগে না যদিও, কিন্তু আলাদা আলাদা ক'রে খোদাইকরা

কলম্বোর জাহাজঘাটে রবীন্দ্রনাথ



আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রবীন্দ্রনাথ ও লেখিকা

(শশী ভিলা, বরাহনগর, ১৯৩২)

মূর্তিগুলো তার গায়ের উপর যখন দেখি মনে হয় এর যেন তুলনা নেই।

গাড়ি ছাড়বার পর ডাইনিং কার থেকে কবির জন্যে খাবার আনিয়ে দিয়ে আমরা তিনজন ব'সে রইলাম ত্রিচিনাপল্লী ষ্টেশনের 'হিন্দু খাবারের' আশায়। আগেই আমাদের জানা ছিল যে ঐ স্টেশনের দেশী খাবার খুবই চমৎকার। ইচ্ছে হ'লে রেস্তোরাঁতে ব'সেও খাওয়া যায় নাহলে তারা গাড়িতে পরিবেশন ক'রেও খাওয়ায়। যখন ত্রিচিনাপল্লীতে গাড়ি থামলো, ঝকঝকে পিতলের টিফিন ক্যারিয়ারে ক'রে গাড়িতে দিয়ে গেল, এবং সঙ্গে রেশমের মতো কচি কলাপাতা। কবি দুঃখ করতে লাগলেন স্পেন্সারের খাবার খেয়েছেন ব'লে। তিনি যদিও কোনোদিনই ঠিক বাঙালীর মতো ভাতের ভক্ত ছিলেন না তবু আমাদের গরম গরম ভাত, বাটিভরা ভালো ঘি, সঙ্গে ডাল, তরকারী, ভাজা, আচার, রসম ও দৈ দেখে বুঝতে পারলেন 'হিন্দু খাবার' খুবই তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া যেত। যে ব্রাহ্মণ গাড়িতে এসে পরিবেশন করছিল তার গায়ের রং দিব্যি গৌরবর্ণ, স্নান করা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চেহারা, পরনে লাল চেলী—দেখতে ভালো লাগে। একজনের মতো খাবার ব'লে যা দিল তা আমরা অনায়াসেই তিনজনে খেতে পারতাম। এক একজনের খাবারের দাম মাত্র ছয় আনা, এর ভেতর দৈ, ঘি, এমনকি গ্লাসে ক'রে দুধও ধরা আছে। কবি আমাদের খাবারের চেহারা দেখে শুনে বললেন, "আমাকে তোমরা কী কতগুলো মাছ মাংস খাওয়ালে তিন টাকা খরচ ক'রে, হয়তো কোনোটা বাসিই হবে—আমি অনায়াসেই এই খাওয়া খেতে পারতুম।

তোমরা তো বলছ এতে ঝালও তেমন বেশি দেয়নি, তবে আমি খেলে কী দোষ হত?" তখন তো আর উপায় নেই, যা হবার হয়ে গিয়েছে। তবু আমরা যে ভালো খেলাম তাতেই উনি খুশি হলেন। আমার তৃপ্তি ক'রে ডাল-ভাত মেখে খাওয়া দেখে বললেন, "এই বঙ্গরমণীর ভাত পেলে কী আনন্দ। বাঙাল কিনা, তাই বিলেতেও রাস্তায় রাস্তায় দোকান খুঁজে বেড়াত কোথায় চাট্টি ভাত পাওয়া যায়।" মনে আছে বিলেতে অনেকদিন ভাত না খেতে পেয়ে যখন হা হুতাশ করতাম তখন কবি বলতেন, "আচ্ছা দ্যাখো, তোমাকে আজ এমন ক'রে আলু-সেদ্ধ মেখে খাওয়াব যে তোমার মনে হবে বুঝি ভাতই খাচ্ছো।" হোটেলের ম্যানেজারকে ব'লে পাঠাতেন কিছু বেশি ক'রে আলু-সেদ্ধ দেবার জন্যে। তাতে খুব যত্ন ক'রে মাখন, মাষ্টার্ড, লবণ, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, ডিম-সেদ্ধ ইত্যাদি দিয়ে এমন ক'রে মাখতেন যে খেতে চমৎকার লাগত—ঠিক মনে হত যেন ভাতে সেদ্ধ ভাত খাচ্ছি। এমনি ক'রে মেখে আমাকে অনেকবার খাইয়েছেন ব'লে জানতেন ভাতের সম্বন্ধে আমার কী টান।

গাড়ি ভোরবেলা গিয়ে মাদ্রাজে পৌঁছলো। এবারে আর জাহাজ ধরবার তাড়া নেই। এবারেও আমাদের আস্তানা হল মিঃ ক্যাণ্ডেথের বাড়িতেই। তখন জুন মাসের মাঝামাঝি—বর্ষা আপন দখল কায়েমি ক'রে জমিয়েছে, কাজেই গরমটা আরও ভাপ্সা. সেই রাত্রেই যাতে ক'লকাতা রওনা হওয়া যায় সেইজন্যে কবি ব্যস্ত হলেন। একে ওঁর অসুস্থ শরীর, তাতে এই দীর্ঘ যাত্রার অবসাদ, সামনেও লম্বা পথ—সকলেই পরামর্শ দিলেন অন্তত একটা দিনও বিশ্রাম ক'রে যেতে।

কবি কিছুতেই রাজী নন, অবশেষে বিধাতা আমাদের সহায় হলেন। স্টেশনে গিয়ে জানা গেল সেদিনকার ডাক-গাড়িতে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা কামরাও খালি নেই। অগত্যা একটা দিন না থেকে আর কী উপায় ?

স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তখন মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার, কাজেই ব্যাঙ্গালোরে রয়েছেন। অধ্যাপক বললেন, তিনি ঐ একদিনের মধ্যেই একবার ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা ক'রে আসবেন। পরদিন ভোরেই ফিরে আসবার ট্রেন আছে, কাজেই ক'লকাতার গাড়ি ধরতে কোনো অসুবিধা হবে না। সকালের গাড়িতেই তিনি চ'লে গেলেন, আমি ও মিঃ আরিয়াম্ কবির কাছে রইলাম।

অধ্যাপক সেই সময় রাশিবিজ্ঞানের Biometry-র একটা কাজ প্রায় শেষ ক'রে এনেছেন। সে কাজের সূচনা ১৯১৭ সালে ওঁর ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ফলেই হয়েছিল। বেড়াবার সময় দিনরাত খেটেছেন এই কাজটা নিয়ে, যাতে ফিরতি পথে মহীশূর গিয়ে ডক্টর শীলকে পেপারটা দেখিয়ে আনতে পারেন। বৃদ্ধ তাহ'লে মহা খুশি হবেন। সেইজন্যে পর্বতপ্রমাণ বই, মোটা মোটা বাঁধানো Biometrika, আর রাশি রাশি কাগজপত্র মাথায় ক'রে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। এণ্ড্রুজ সাহেব পাহাড়ে যাবার বেলা আমার বিছানার বোঝা লাঘব করিয়েছিলেন কিন্তু তার চেয়ে অনেক ভারি অধ্যাপকের বই খাতা সম্বন্ধে আপত্তি করতে পারেননি। সেইগুলোই হোল্ড-অল্-এর ভেতর বিছানার বদলে গিয়েছিল। কবি দিনের বেলায় খানিকক্ষণ আমার স্বামীকে না দেখতে পেলেই ঠাট্টা ক'রে বলতেন, "ঐরে

আবার অঙ্ক কষতে বসেছে। আজ আর তাহ'লে তোমার কোথাও বেরোন হবে না।" তারপরই হেসে বলতেন, "জানো, ঐ জায়গায় ও আমাকে বেজায় হারিয়ে দিয়েছে। দিনরাত খাতার উপর ঝুঁকে প'ড়ে ও যখন অঙ্ক কষে, দেখে ভারি হিংসে হয়, আর নিজের 'পরে রাগ ধরে ছেলেবেলায় ইস্কুল পালিয়েছিলাম ব'লে। তা না হ'লে দেখতে আজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কী কাণ্ড করত।" আমি হো হো ক'রে হেসে উঠতাম, নিজেও সে হাসিতে যোগ দিয়ে বলতেন, "না না, হাসির কথা নয়; প্রশান্তর মোটা মোটা অঙ্কের বইগুলো যখন দেখি তখন ভাবি ঐ একটি রাজ্যে শুধু আমার প্রবেশ করা হোল না। আর সবই তো কিছু কিছু করলুম; এমনকি এই শেষ বয়সে নন্দলালের সঙ্গে পাল্লা দিতেও ভয় পেলুম না, শুধু তোমার কর্তৃপক্ষের সঙ্গেই আমার কম্‌পিটিশনের রাস্তা বন্ধ। অনেক সময় ভাবি এখনও আরম্ভ করলে যদি হত তো একবার চেষ্টা দেখতুম; কিন্তু আর হয় না—বড্ড দেরি হয়ে গেছে; কাজেই বাধ্য হয়ে ওর কাছে মাথা হেঁট ক'রে থাকি।" আমার হাসি আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলে বলতেন, "তুমি বিশ্বাস করছ না? সত্যিই আমার দুঃখ আছে সায়েন্স পড়িনি ব'লে, বিশেষ ক'রে ম্যাথমেটিক্‌স্‌টা।" এই রকম হাসি-তামাশা যখন চলত হঠাৎ হয়ত ব'লে উঠতেন, "তুমি দেখো, সাংখ্যিক ভারি খুসি হয় এইসব কথা বললে—জানে কিনা ঐ জায়গায় ওর জিত, কারণ আমার লেখা ও প'ড়ে উপভোগ করতে পারে কিন্তু ও যে সারাদিন কী করছে আমার বোঝবার উপায় নেই। এখানে তোমার আর আমার অবস্থা একেবারে সমান।"

যাহোক অধ্যাপক মহীশূর চ'লে যাওয়ার পরে মিঃ ক্যাণ্ডেথ্ আপিস্ থেকে ফিরে এসেছেন, আমাদের চা খাওয়া শেষ হয়েছে, সবাই ব'সে গল্প করছি ; বেলা তখন সাড়ে পাঁচটা কি ছ'টা হবে, কবি হঠাৎ ব'লে বসলেন, "আচ্ছা, প্রশান্ত একাই ব্রজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করবে, আর আমিই বা না করব কেন ? আবার কবে এদিকে আসা হবে না হবে কে জানে ? ঘরের পাশে এসে ওঁকে না দেখে ফিরে যাওয়া কি উচিত ?" ব্রজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের অনেক দিনের বন্ধু, প্রস্তাবটা যুক্তি-সঙ্গতও বটে, তবে শরীরের কথাটাও তো নিতান্ত অবাস্তব নয়। তাই আরিয়াম্ মৃদু আপত্তি তুললেন। আমি মনে মনে জানতাম এ খেয়াল কবির একবার যখন হয়েছে তখন আমাদের আপত্তিতে কোনো ফল হবে না।

ট্রেন ছাড়তে আর ঘণ্টা দুই দেরি। মিঃ ক্যাণ্ডেথ্ স্টেশনে ফোন ক'রে জানলেন যে গাড়ীতে জায়গা আছে। কবি বললেন, "আরিয়ামের যাবার কোনো দরকার নেই, রানীই একা আমাকে নিয়ে যেতে পারবে।" তাড়াতাড়ি ক'রে সমস্ত জিনিসপত্র বেঁধে নিলাম। ব্যাঙ্গালোর অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জায়গা, কাজেই কুন্নুরের মতো বিপদ যাতে না হয় তাই বিশেষ ক'রে হাল্কা গরম কাপড়গুলো বিলেতের বাক্স থেকে বের ক'রে একটা স্যুটকেসে সাজালাম। অল্প ক'দিনের মতো যা দরকার তাই সঙ্গে যাবে, বাকি সব মালপত্র মাদ্রাজে প'ড়ে থাকবে—আমরা ফিরতি পথে তুলে নিয়ে যাব এই ব্যবস্থা। কবির মুখ-ধোবার জিনিসের ছোটো হাতবাক্সে অন্তত দু'বার স্নানের মতো পোশাক ভ'রে নেওয়া আমার বরাবরের অভ্যাস। কি জানি, স্টেশন থেকে বড় বাক্স তোরঙ্গ এসে পৌঁছতে যদি

দেরি হয়। স্নানের যাতে দেরি না হয়ে যায় তাই এই সতর্কতা। ভারতবর্ষে ঘোরবার সময় ওঁর পুরানো চাকর বনমালী সঙ্গে থাকে। এবারে পশ্চিমগামী ব'লে আর কেউ সঙ্গে আসেনি, কাজেই আমি আরো ভয়ে ভয়ে থাকি পাছে আমার কোনো ত্রুটিতে কবি অসুবিধায় পড়েন। তাই যে যে বাক্স যাবে এবং যে ক'টা থাকবে সব মিঃ ক্যাণ্ডেথের একটা খালি ঘরে সাজিয়ে আরিয়ামের জিম্মা ক'রে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম যাতে মিঃ আরিয়াম্ আগেই যখন জিনিস নিয়ে স্টেশনে যাবেন তখন কোনো বিভ্রাট না বাধে।

ট্রেন ছাড়ার অল্প আগে ধীরে সুস্থে মিঃ ক্যাণ্ডেথ্ কবিকে পৌঁছে দিলেন। গিয়ে দেখি রেলের কামরায় বেঞ্চির নিচে সব বাক্স তোরঙ্গ ইতিমধ্যেই আরিয়াম্ দিব্যি ক'রে সাজিয়ে দিয়েছেন—বিছানা পাতা—কোনো কিছুরই ত্রুটি নেই।

গাড়ি ছাড়বার মুহূর্তে মিঃ আরিয়াম্‌কে জিজ্ঞাসা করলাম, "যে জিনিসগুলো দোতলা থেকে আপনার কাছে নিচে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম সব এসেছে তো?"

"হ্যাঁ, সব এসেছে।" বলতে বলতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। একটু পরে যখন কবি বিছানার উপর গুছিয়ে বসেছেন, ভাবলাম জিনিস ক'টা একবার নিজের চোখে দেখে নিই। অল্প আলো—মোটামুটি সবই চোখে পড়ল, শুধু কবির সেই কাপড়ের বাক্সটা নেই। বুকের মধ্যে যেন রক্ত জমাট বেঁধে গেল—কী হবে? প্রাণপণে আশা করতে লাগলাম যে নিশ্চয়ই বেঞ্চির তলায় কোথাও গোঁজা আছে, অন্ধকারে হয়তো আমার নজরে পড়ছে না। এ কখনো হয় যে আরিয়াম্ এত বড় ভুল করবেন? তিনি তো জানেন কবির সমস্ত

কাপড় তার মধ্যে—তাঁর সামনেই আমি জিনিস গুছিয়েছি, সে বাক্স প'ড়ে থাকলে আর উপায় নেই, কাজেই নিশ্চয়ই সেটা মনে ক'রে দিয়েছেন। যাই হোক, কবিকে আর কিছু বললাম না—মিথ্যে তাঁকে ভাবিয়ে লাভ কী? সকালে ব্যাঙ্গালোর পৌঁছে যা হয় করা যাবে।

সুটকেসের ভাবনায় সারারাত ঘুম হল না। একে এই প্রথম একা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পথে চলেছি,—তার দায়িত্ব কম নয়—তার উপরে যাত্রার শুরুতেই এই এত বড় একটা অঘটন।

কবি খুব ভোরেই তখন চা খেতেন। সে আমলে বনমালীকে রাত দুটোর সময় উঠে উনুন ধরাতে দেখেছি। সেদিন আমি রাত চারটের সময়, কোন্ স্টেশনে মনে নেই, প্ল্যাট্‌ফর্মে নেমে একটা খানসামাকে ধ'রে রিফ্রেশমেণ্ট রুম থেকে কবির জন্যে চা সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এলাম। উনি তো মহা খুশি। পুরুষ-জাতীয় কোনো সঙ্গী না থাকা সত্বেও যে এত ভোরে চা পাওয়া যাবে তা ভাবেননি, তাই বার বার আমাকে বাহবা দিলেন। কিন্তু কবি তো জানেন না যে কেন আমি এত ভোরে উঠতে পেরেছি।

ভোর পাঁচটায় বোধ হয় ব্যাঙ্গালোরে গাড়ি পৌঁছল। মাদ্রাজ থেকে ব্রজেন্দ্রনাথকে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল। বৃদ্ধ মহা খুশি হয়ে কবিকে নিতে স্টেশনে এসেছেন, সঙ্গে আমার স্বামীও। অধ্যাপক তো অবাক। ব্যাঙ্গালোরে পৌঁছেই খবর পেলেন যে আমরাও পরদিন ভোরে আসছি, অথচ রওনা হবার আগে কিছুই শুনে আসেননি।

ট্রেনে আসবার সময় কবি খুব হাসতে হাসতে বলেছিলেন,

"প্রশান্ত বেজায় জব্দ হবে। ভেবেছিল ও একাই ব্যাঙ্গালোর বেড়িয়ে যাবে, আর আমরা এই গরমে মাদ্রাজে প'ড়ে থাকব। কেমন সকালে বলল, 'আচ্ছা, আপনারা থাকুন, আমি দৌড়ে একবার ডক্টর শীলকে দেখে আসি।'—কেনরে বাপু, আমিই বা কী অপরাধ করলুম ? তাঁকে তো আমিও একবার দেখে যেতে পারি। বেশ মজা হয়েছে, কী বলো ?" কবির সেই ছেলেমানুষের মতো ফুর্তি—আজও স্পষ্ট সে চেহারা দেখতে পাচ্ছি।

মনে পড়ছে এরকম ঘটনা আরো একদিন ঘটেছিল। ১৯২৬ সালে নভেম্বর মাসে তখন আমরা হাঙ্গেরীতে। বুডাপেস্ট থেকে একশ' মাইল দূরে ব্যালাটন হ্রদের ধারে একটা স্বাস্থ্যনিবাসে রবীন্দ্রনাথ তখন বিশ্রাম করছেন। ব্যালাটন ফ্যুরেডের এই স্যানাটোরিয়াম্ কার্বনিক অ্যাসিড্ বাথের জন্য বিখ্যাত।

বুডাপেস্টে কবি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন খবর পেয়ে এই স্যানাটোরিয়াম্-এর কর্তৃপক্ষ কবিকে নিমন্ত্রণ ক'রে এখানে বিশ্রামের জন্য নিয়ে আসেন।

জায়গাটা যেমন নির্জন তেমনি সুন্দর। স্যানাটোরিয়াম্-এর বাড়িটার চারিদিকে অজস্র ম্যাগ্‌নোলিয়া ফুলের বড় বড় গাছে ফুল ফুটে রয়েছে। আমি অতগুলো ম্যাগ্‌নোলিয়া গাছ একসঙ্গে আর কখনো দেখিনি। ছোট্টো গ্রামখানি, চারিদিকে শস্যক্ষেতে ফসল পেকে সোনার মতো রং ধরেছে, তার মাঝে মাঝে চাষাদের ছোটো ছোটো কুঁড়ে ঘর। সারাদিন নানা-রকমের পাখির ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। তখন হেমন্তকাল, চতুর্দিকের গাছপালায় যেন আগুন ধরেছে এমনি

লাল আর সোনার রং—ঠিক ঝ'রে পড়বার আগে পাতাগুলোর যেন শেষ চেষ্টা মানুষের মন ভোলাবার। য়ুরোপের এই হেমন্ত-কালের চেহারা আমার কাছে অনির্বচনীয় সুন্দর মনে হয়েছিল। স্বাস্থ্যনিবাসের যোগ্য পরিবেশ বটে এই ব্যালাটনফ্যুরেড গ্রাম।

ব্যালাটনফ্যুরেড থেকে ষাট সত্তর মাইল দূরে বহুদিনের পুরোনো একটা মনাস্টারি আছে, যেটা অনেক লোক দেখতে যায়। একদিন সকালে কবি ব'সে লিখছেন এমন সময় মঠের যিনি বড় পাদ্রী তিনি এলেন কবির সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর ইচ্ছে কবিকে একবার তাঁদের মঠে নিয়ে যান।

কোথাও যেতে হবে শুনলেই কবির মন তখন বেঁকে বসতো, বোধ হয় শরীর ক্লান্ত ব'লে। বলতেন, "আর পারিনে বাপু, তোমরা ঘুরে এসো।" সেদিনও তাই হল। কিছুতেই এতটা পথ যেতে রাজি হলেন না। কী একটা লেখা তখন লিখছিলেন সেটাও তার একটা কারণ।

অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে সেই ফাদার-এর কাছ থেকে ছুটি নিলেন। কিন্তু আমাদের তু'জনকে একরকম জোর ক'রেই পাঠিয়ে দিলেন নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে আসতে।

ফসল ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে চমৎকার রাস্তা চ'লে গেছে—মোটরে যেতে যেতে চারিদিক যেন ছবির মতো লাগছিল। এক জায়গায় মনে আছে অনেকক্ষণ ধ'রে খুব সোজা রাস্তা পার হ'তে হয়, তার তু'ধারে লম্বা পপ্‌লার গাছের সারি, যতদূর চোখ যায় পথটার যেন শেষ নেই, সাদা সরু ফিতের মতো মাটিতে প'ড়ে রয়েছে আর তার তু'পাশে এই পপ্‌লার গাছের বীথি। দেখতে এত সুন্দর লেগেছিল যে আজও ছবিটা মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

প্রায় ঘণ্টাদেড়েক পরে গিয়ে পৌঁছলাম সেই মঠে। চারিদিকে যা কিছু দেখবার সকলকেই খুব যত্ন ক'রে দেখালেন। সেই বৃদ্ধ পাদ্রী আমাদের হ্রদের ধারে (ব্যালাটন হ্রদেরই আর এক প্রান্তে এই মঠ) বেড়াতে নিয়ে গেলেন, ছবি তুললেন। তারপর অনেকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে আমরা যখন দুপুরে মঠে ফিরে এসে খেতে বসেছি আর ভাবছি "কবি এতক্ষণে একা একা ব'সে খাচ্ছেন" এমন সময় মঠের একজন তরুণ সন্ন্যাসী খুব উত্তেজিত হয়ে এসে বৃদ্ধকে খবর দিলেন যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত। ঘরশুদ্ধ সবাই মুহূর্তের মধ্যে খাওয়া ছেড়ে উঠে গিয়ে কবিকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে এলেন। সকলের আনন্দ আর ধরে না। খেতে ব'সে কবি হেসে আমাকে বললেন, "ভেবেছিলে একাই বেড়িয়ে যাবে আর আমার কাছে গিয়ে নানা রকম গল্প করবে, না? আমিই বা কেন বাদ যাব? স্যানাটোরিয়াম্-এর ডাক্তার যখন বললেন এই পথটা এবং মঠ দু'টিই দেখবার যোগ্য তখন দুঃখ হ'তে লাগল তোমাদের সঙ্গে আসিনি ব'লে। ডাক্তার তখন বললেন আমি যদি রাজি থাকি তাহলে তিনি তাঁর নিজের মোটরে ক'রে এখনি আমাকে নিয়ে আসতে পারেন যাতে খাওয়ার আগেই পৌঁছে যাব, তাই চ'লে এলুম। আসল কথা, তোমার কাছে কিছুতেই হার মানব না।"

ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেকদিন পরে কবির দেখা—দু'জনেই খুব খুশি পরস্পরকে কাছে পেয়ে।

প্রকাণ্ড বাড়ি ব্যালাক্রুয়ি—আমাদের খুব আরামেই থাকবার ব্যবস্থা হল।

স্টেশন থেকে বাড়ি পৌঁছে চা খেয়ে যখন সবাই স্থির হয়ে

বসেছেন তখন ভয়ে ভয়ে কবিকে খবর দিলাম যে "কাপড়ের বাক্সটা আসেনি।"

"আর লেখবার বাক্স?" "সেটা ঠিকই আছে।"

"আচ্ছা, তাহলে আপাতত অমিট্ রায়কে নিয়ে পড়া যাক। আর ইতিমধ্যে আরিয়াম্‌কে টেলিগ্রাম ক'রে দাও আজই জিনিসটা নিয়ে চ'লে আসুক।" একটু হেসে বললেন, "আসলে আরিয়ামেরও এখানে আসতে ইচ্ছে ছিল তাই বাক্সটা দিতে ভুলে গেছে। আমার কথা বিশ্বাস না হয় বৈজ্ঞানিককে জিজ্ঞাসা করো সাইকোয়্যানালিস্টরা কী বলে।"

মনে ভয় ছিল কত না জানি বিরক্ত হবেন, খুঁতখুঁত করবেন। এত সহজেই শেষ হয়ে গেল—আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

লেখবার বাক্স এসেছে—খুশি মনে গিয়ে টেবিলে বসলেন। স্নানের সময় পেরিয়ে যায়, তবু লিখছেন। গরম জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে খবর দেওয়াতে বললেন, "কাপড়ই যখন নেই তখন স্নান ক'রে কী হবে?" মুখ ধোবার বাক্সে স্নানের মতো কাপড় এনেছি শুনে মহা খুশি হয়ে টেবিল চাপড়ে বললেন, "এই তো গিন্নিপনা। মেয়েমানুষ না হ'লে কি এত বুদ্ধি হয়? সংসার করবার সময় যে অনেক ভেবে চিন্তে হঠাৎ দরকারের জন্যে অনেক জিনিস হাতে রেখে দিতে হয়—তাই তো আজ স্নানটা হবে। এ কি আমার সায়েন্টিস্ট বা আরিয়ামের মতো পুরুষমানুষের কর্ম? সাধে আর তোমাকে সঙ্গে এনেছি? তোমার বুদ্ধির উপর আমার বেজায় ভরসা। (কথাটা এমন মজা ক'রে বললেন, না হেসে পারলাম না।) যদি স্নানই করতে পারব তবে তো কোনো ভাবনাই নেই।"

কবির বরাবরই যেটা হয়ে গিয়েছে সেটাকে মেনে নেওয়া স্বভাব। কোনো কিছু নিয়ে ক্রমাগত খুঁতখুঁত করতে দেখিনি ; তাই যখন শুনলেন কাপড়ের বাক্স মাদ্রাজে প'ড়ে আছে, সেটা অত্যন্ত অসুবিধার ব্যাপার হ'লেও মনে মনে অবস্থাটা তৎক্ষণাৎ মেনে নিয়ে সহজেই লেখার মধ্যে ডুব দিলেন। তখনই স্থির ক'রে নিয়েছিলেন যে আরিয়াম্ পরদিন বাক্স নিয়ে না আসা পর্যন্ত স্নান করবেন না, কাপড় তো নেই কাজেই ছাড়বেন বা কেমন ক'রে ? কাজেই স্নান করতে পারা যাবে এটা ওঁর কাছে অপ্রত্যাশিত সুখবর।

ব্যাঙ্গালোরেও "যোগাযোগ" এবং "শেষের কবিতা" দুখানা বই-ই পাশাপাশি লেখা চলল। একটু একটু ক'রে লেখা যেমন এগোত আমাদের প'ড়ে শোনাতেন। ভারি আশ্চর্য লাগত যে দুটো লেখার ভাষা ও ধরন সম্পূর্ণ আলাদা হ'লেও কবির একই সঙ্গে দুখানা বই লিখতে কিছুই অসুবিধা হত না। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, "কি ক'রে এই লেখা আপনি এক সঙ্গে লিখছেন? দুটো গল্প যে একেবারে আলাদা, কাজেই আপনার অসুবিধা হয় না ?"

"অসুবিধা হবে কেন ? আমি যে সারাদিন ওদের দেখতে পাই, কথাবার্তা বলি ওদের সঙ্গে। কাজেই লিখতে বাধে না। কুমুর সঙ্গে যখন কথা বলি তখন বিপ্রদাস, মধুসূদন ভিড় ক'রে এসে দাঁড়ায় ; প্রত্যেকেরই মুখের কথা আপনিই আমার কলমে এসে যায়। আবার অমিট্ রায়দের নিয়ে যখন পড়ি তখন সিসি, লিসি, কেটি, ওদের ফ্যাশানেবল্ সমাজ, সমস্ত অ্যাট্‌মস্‌ফিয়ারটা মাথার মধ্যে জ'মে ওঠে। এর মধ্যে লাবণ্য, লাবণ্যর মাসী একেবারে অন্য জাতের

মানুষ। লাবণ্যর সঙ্গে যেন আমার চেনা-শোনা আছে, খুব যেন তাকে দেখেছি।" এত ভালো লাগত কবির মুখে এই রকম ওঁর লেখার কথা শুনতে। যখন চুপ ক'রে ব'সে থাকতেন, মুখ দেখে বুঝতে পারতাম এদের নিয়ে মনটা ভ'রে রয়েছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ একদিন বললেন, "আপনি যে নতুন গল্প লিখছেন প্রশান্তর কাছে শুনছিলাম। আমাকে কিন্তু প'ড়ে শোনাতে হবে।" কবি বললেন, "একেবারে শেষ ক'রে নিয়ে তারপর শোনাব।"

ব্যাঙ্গালোরের স্বাস্থ্যকর ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে কবির শরীর তাড়াতাড়ি অপেক্ষাকৃত তাজা হয়ে উঠল। আরও সুবিধা যে বাড়িতে আমরা ছাড়া আর অন্য কোনো লোক নেই। বাই-রের সামাজিক দাবি মনের উপর একটুও চেপে বসেনি, কাজেই লেখা নিয়ে কবির আনন্দে দিন কেটে যেতে লাগল।

ব্রজেন্দ্রনাথ একা মানুষ, তার উপরে গৃহস্থালি বিষয়ে একেবারে আনাড়ি বললেই হয়। আমি যাবার দু'দিন পরে আমাকে ডেকে বললেন, "রানী, কবি কী খান বা না খান, কোন্‌টা কখন দরকার না দরকার আমি কিছুই বুঝিনে। আমার চাকর-বাকরও অত্যন্ত দুষ্টু—আমার কোনো কথা শোনে না, কাজেই তোমরা যতদিন আছো তোমার হাতে আমি ভাঁড়ারের চাবি খরচের টাকা সব কিছু দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চাই, কারণ আমার ইচ্ছে কবি যতদিন আমার কাছে আছেন কোনো সময় কোনো কারণেই যেন ওঁর কিছু অসুবিধা না হয়। যখন যা দরকার তুমি নিঃসঙ্কোচে নিজে হুকুম ক'রে চাকরদের দিয়ে করিয়ে নিও—বাস্‌, তাহলেই হল।" খবর

নিয়ে জানলাম ডক্টর শীলের বাবুর্চি দু'দিন ধ'রে আমাদের জন্যে ত্রিশ টাকা ক'রে দিনে শুধু বাজার খরচ নিচ্ছে, তা ছাড়া চাল ডাল তো সব ঘরেই আছে। এ সত্ত্বেও রোজ টেবিলে খাবার সময়ে অত্যন্ত মোটামুটি রকমের ভোজ্য পদার্থ উপস্থিত হচ্ছে, পরিমাণেও খুব বেশি নয়। বৃদ্ধ অসহায়ভাবে দু'দিন তাই দেখে তারপর আমার শরণ নিতে বাধ্য হয়েছেন। পাঁচজন মানুষের জন্যে ১৯২৮ সালে ত্রিশ টাকা ক'রে রোজ বাজার খরচ! শুনেই তো আমার চক্ষুস্থির। গৃহস্থালির ভার হাতে নিয়ে যখন ঐ-সব চাকরদের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটল তখনই বৃদ্ধের ব্যাকুলতার অর্থ বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমার কাছে তাদের বিশেষ সুবিধা হবে না বুঝে একটু সামলে যেতে বাধ্য হল—ত্রিশ টাকা থেকে ছ'টাকায় খরচ নামল। প্রতিদিন মোটর নিয়ে বেরোলেই একবার বাজার ঘুরে আসতাম, দেখাও হত কাজও হত। ফিরে এলে কবি উৎসাহ ক'রে জিজ্ঞাসা করতেন, "আজ কী নতুন জিনিষ আবিষ্কার করলে? দইবড়া না আচারের দোকান?" আমি হয়তো সেদিন খুব ভালো 'মৈশোর পাক' (দক্ষিণের বিখ্যাত মিষ্টি) নিয়ে এসেছি—বললাম, "না, আজকের আবিষ্কার মিষ্টি।"

"উঃ! কী উৎসাহ খাবার জিনিস খুঁজে বের করতে, আর বিশেষ ক'রে মিষ্টি—তা না হ'লে এরকম পূর্ণচন্দ্রের মতো মুখ হবে কেমন ক'রে? কেমন দিব্যি মোটাসোটা গোলগাল। সত্যি, এই উৎসাহ নিয়ে যদি স্ট্যাটিস্টিক্স্-এ মন দিতে তাহলে অধ্যাপক ঘরেই একটি অ্যাসিস্টেণ্ট পেত—কত পরিশ্রম বেঁচে যেত।" শুনে আমরা যখন সকলে হেসে অস্থির তখন হঠাৎ মাঝখানে ব'লে উঠলেন, "না, না, তোমাকে এ

পথে উৎসাহ দেওয়া ঠিক নয়। ভাগ্যি তুমি সে চেষ্টা করোনি তাই তোমার বাড়ি গিয়ে থাকি, তা না হলে স্ট্যাটিস্টিক্‌স্‌-এর 'স্টিক্স'-এর ভয়ে আর ওমুখোই হ'তে পারতুম না," ব'লে নিজেও আমাদের সঙ্গে হো হো ক'রে হাসি। এরকম হাসির খোরাক আমাদের সর্বদাই বরাদ্দ ছিল। একদিন বাজার থেকে এসে বললাম, "আজকে যা জিনিস আবিষ্কার করেছি কল্পনাও করতে পারবেন না।" "শুনি কী রকম?"

"আটশ' (৮০০৲) টাকা দামের রেশমের শাড়ি, তার পাড় হচ্ছে, যে চেটি ফরমাস দিয়েছে তার নিজের নামটাই বার বার ক'রে লেখা, আর শাড়ির জমিটাতে সারা গায়ে জরি দিয়ে প্রাইমাস্‌ স্টোভ, তার উপরে সস্‌-প্যান্‌ আঁকা। কোনো এক চেটি তাঁর স্ত্রীর জন্যে এই অপূর্ব নক্সার কাপড় ফরমাশ দিয়ে করিয়েছেন। অথচ এখানকার পুরোনো শাড়ির যে কী চমৎকার নমুনা দেখলাম তা বলতে পারি না। দুঃখের বিষয়, সে-রকম শাড়ি বাজারে তৈরি কিনতে পাওয়া যাবে না, ফরমাস দিলে ক'রে দিতে পারে। এর কারণ জিজ্ঞাসা করাতে দোকানী বলল, 'এখানকার লোকদের আর এ-সব পুরোনো নক্সা পছন্দ হচ্ছে না, তাই তাঁরা ও-রকম কাপড় তৈরি রাখে না।' চেটির পছন্দ দেখেই বুঝলাম কথাটা ঠিক, নইলে আর নিজেদের দেশের এত চমৎকার বাঘ, সিংহ, হাতির নক্সা ছেড়ে প্রাইমাস্‌ স্টোভ দিয়ে শাড়ি বানায়? তার উপর আবার আটশ' টাকা দাম দিয়ে?"

কবি শুনে এত দুঃখিত হলেন। বললেন, "এমনি ক'রেই আমাদের দেশের সব শিল্পকলা নষ্ট হয়ে গেল। দেশের ধনী যারা তাদেরই এটা রক্ষা করবার দায়িত্ব। কিন্তু আমাদের

দেশের ধনী সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ লোকই সংস্কৃতি-বর্জিত। এই জন্যেই ঢাকাই শাড়ি যা আমাদের গৌরবের জিনিস ছিল তা মরতে বসেছে। তার জায়গা নিয়েছে খেলো ঝকঝকে সিফন, জর্জেট। এও সেই আধুনিক নূতনত্বের মোহে। তোমাদের দু'চারজন মেয়েরও অন্তত এর বিরুদ্ধে অভিযান করা উচিত। তোমরা কি চোখের সামনে আমাদের এই রকম সব ভালো ভালো জিনিস লোপ পেয়ে যেতে দেবে?"

আমি বললাম, "আমার আর কতটুকুই বা সাধ্য বলুন না। তবু তো আমি যেখানে যাই প্রাণপণ চেষ্টা করি পুরোনো জিনিস খুঁজে বের করতে। অনেক সময় অনেক জিনিস সংগ্রহ করেছি শুধু নক্সার লোভেই, হয়তো এত পুরোনো এবং নষ্ট যে আমার কোনোই কাজে লাগেনি সে জিনিস।" কবি বললেন, "হ্যাঁ, বৌমাকেও দেখেছি, এ-বিষয়ে তাঁর উৎসাহ আছে। দেখে আমি খুব খুশি হই। ওঁর তো উৎসাহ হওয়াই উচিত; কারণ এত বড় আর্টিস্টের ঘরে মানুষ হয়েছেন, তাছাড়া নিজেও যে আর্টিস্ট। তোমরা দু'চারজন মিলেও এ-রকম চেষ্টা না করলে কিছুদিন পরে আমাদের দেশে কত যে সুন্দর জিনিস তৈরি হত তা লোকের মনেও থাকবে না। এই জন্যেই তো মহাত্মাজীর সঙ্গে আমার বনে না। শুধু যদি খদ্দর পরতে আরম্ভ করি তাহলে এইসব মাদ্রাজী রেশমী শাড়ি, আমাদের বাংলাদেশের ঢাকাই শাড়ি, এদের কী দশা হবে? শেষকালে তাঁতীরা এ-সব নক্সাই যে ভুলে যাবে।" কবি শুনে খুশি হলেন যে, আমি একটা শাড়ি ফরমাস দিয়ে এসেছি। বললেন, "আমার জন্যেও একটা তৈরি করতে ব'লে দাও, মীরুকে দেব?"

ব্যাঙ্গালোরে কবির শরীরও ভালো মনও খুশিতে ছিল তাই কুন্থুরের মতো পালাই-পালাই ক'রে অস্থির হননি। কলম্বো থাকতেও উনি লিখতেন, কিন্তু এত বেশি না। তখন শরীর আরো খারাপ এবং ভাপ্‌সা গরমে মনে তত উৎসাহ ছিল না। কলম্বোতে "যোগাযোগ"টাই বেশি লেখা চলত, মাঝে মাঝে "শেষের কবিতা"। ব্যাঙ্গালোরে ব্রজেন্দ্রনাথ "শেষের কবিতা"টা শোনবার দাবি করায় ওটার দিকেই বেশি মন গেল। আমরা বোধহয় দিন দশ-বারো ছিলাম ওখানে—ঠিক মনে নেই। চ'লে আসবার দু'তিন দিন আগে কবি ব্রজেন্দ্রনাথকে বললেন, "প্রায় শেষ হল। কাল আপনাকে শোনাতে পারব।" রাত্রে খাবার পর সাড়ে এগারোটা বারোটা পর্যন্ত আরাম-চৌকিতে ব'সে তারপর শুতে যাওয়া কবির অভ্যাস। উনি শুতে গেলে সব ঠিক ক'রে দিয়ে ঘরের আলো নিবিয়ে পরে আমি শুতে যাই। সেদিন খেয়ে উঠে পড়বার ঘরের দিকে যেতে দেখে অবাক লাগল, কারণ ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা ব'লে তখন রাত ঢের হয়ে গেছে। আমি আপত্তি করাতে বললেন, "বন্যার লেখাটা আর অল্প বাকী আছে। ওটা শেষ না করা পর্যন্ত সব মাথার মধ্যে ঘুরঘুর করবে, ঘুমোতে পারব না। তার চেয়ে ওটুকু লিখে ফেলেই একটু পরে বেশ আরাম ক'রে ঘুমানো যাবে। তুমি লক্ষ্মীটি গোলমাল ক'রো না, শুয়ে পড়ো, আমি নিজেই আজ আলোটা নিবিয়ে শোব, কোনো হাঙ্গামা হবে না।" অগত্যা শুতে চ'লে গেলাম কিন্তু মনটা ঠিক স্বস্তি পেল না। রাত একটায় ঘুম ভেঙে দেখি তখনও কবির ঘরে আলো জ্বলছে। ভাবলাম এইবারে হয়তো শুতে এসেছেন। আবার একঘুম দিয়ে তিনটের সময় জেগে দেখি

তখনও আলো জ্বালা। এবারে বিছানা থেকে উঠে পড়তেই হল। পা টিপে টিপে শোবার ঘরে গিয়ে দেখি যেমন বিছানা ক'রে এসেছিলাম ঠিক তেমনিই রয়েছে। মশারির মধ্যে কোনো সময়ে কারো ঢোকা হয়নি তা বুঝতে বাকি রইল না। শোবার ঘরের পাশেই পড়বার ঘর—খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে কবি তখনও টেবিলের উপর ঝুকে প'ড়ে লিখছেন। খুব আস্তে আস্তে চেয়ারের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম—টেরই পেলেন না, এত মগ্ন লেখার মধ্যে। আমি আরো একটু কাছে এগিয়ে ঝুঁকে দেখবার চেষ্টা করলাম কোন্ জায়গায় এসেছেন। তখন মাঝে মাঝে নিজের মনে চেঁচিয়ে একটা কবিতার কয়েকটা লাইন পড়ছেন। একবার মনে হল এ-রকম লুকিয়ে শোনা ঠিক হচ্ছে না, ফিরে চ'লে যাই, কিন্তু লাইন ক'টা এত ভালো লাগল যে দাঁড়িয়ে বাকিটা শোনবার লোভ সামলাতে পারলাম না। এসেছিলাম রাত জেগে লেখার জন্যে ওঁকে ভর্ৎসনা করতে, কিন্তু পাছে আমার উপস্থিতিতে লেখার ব্যাঘাত হয় তাই প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। কয়েক লাইন ক'রে লিখছেন আর চেঁচিয়ে আবৃত্তি করছেন। মাঝে মাঝে পছন্দ হচ্ছে না, আবার কাটাকাটি অদলবদলের পর নতুন ক'রে লিখে চেঁচিয়ে পড়ছেন। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলাম:

"শুক্লপক্ষ হ'তে আনি রজনীগন্ধার বৃন্তখানি
যে পারে সাজাতে
অর্ঘ্যথালা কৃষ্ণপক্ষ রাতে,
যে আমারে দেখিবারে পায় অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি,

এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।
তোমারে যা দিয়েছিনু তার পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার।
হেথা মোর তিলে তিলে দান,
করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডূষ ভরিয়া করে পান
হৃদয় অঞ্জলি হ'তে মম।
ওগো, তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্বর্যবান,
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান;
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়
হে বন্ধু, বিদায়।"

আর দাঁড়াতে সাহস হল না, পাছে আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে সামনে গিয়ে ব'লে ফেলি "কী চমৎকার।" ঘরে ফিরে এসে ঘড়িতে দেখি প্রায় চারটে বেজেছে—কবি তো অন্যদিন এর আগেই বিছানা থেকে উঠে পড়েন, কাজেই একটা রাত বিনা ঘুমেই কাটল। সকালে চায়ের টেবিলে যেমন কথাবার্তা বলেন তাই, কোনোরকম ক্লান্তি বা রাত জাগার চিহ্ন নেই চেহারায়। শুধু মুখ দেখলে বোঝা যায় যে, অন্যদিনের চেয়ে সেদিন মনটা একটু বেশি খুশি আছে। আমি যখন বললাম, "এ-রকম শরীর খারাপ নিয়ে কি সারারাত জাগা ভালো হল?" হেসে বললেন, "তুমি কী ক'রে জানলে যে আমি রাত জেগেছি? কাল কি আমাকে স্পাই করছিলে নাকি?" হেসে উত্তর করলাম, "তা একটু করেছি বই কি। যদিও ইচ্ছে ক'রে নয়। মনে মনে সত্যিই অস্বস্তি হচ্ছিল আপনাকে না জানিয়ে ছিলাম ব'লে, কিন্তু 'হে বন্ধু বিদায়'টা শোনবার লোভ সামলাতে পারলাম না, তাই

দাঁড়িয়ে শুনতেই হল।” “ঐ স্তাখো, চুরি ক’রে আমার কবিতাটি পর্যন্ত শুনে নিয়েছ? আজকে প’ড়ে যে চমকিয়ে দেব তা আর হল না।” বললাম, “চমক আমার এখনো ভাঙেনি। সে যাই হোক, আপনি কাজটা কিন্তু ভালো করেননি। আপনি অসুস্থ শরীর নিয়ে যদি এ-রকম অনিয়মই করবেন তাহলে মিথ্যে আমাকে সঙ্গে রেখে আর লাভ কী?” বললেন, “না, না, তোমরা কিছু বোঝো না। আমি তোমাকে বলছি এতে শরীর খারাপ হয় না। লেখাটা মাথার মধ্যে এত বেশি ঘুরঘুর করছিল যে শুলেও উঠে পড়তে হত। এ-রকম অবস্থায় লিখতে না পারলেই শরীর বেশি খারাপ হয়। এখন কেমন মনটা নিশ্চিন্ত লাগছে, তাই শরীরেও কোনো ক্লান্তি বোধ করছিনে।”

সন্ধ্যেবেলা ব্রজেন্দ্রনাথের কাছে লেখাটা চেঁচিয়ে পড়লেন। বৃদ্ধ তো আনন্দে অস্থির—ব’সে ব’সে শুনছেন আর লম্বা দাড়ির মধ্যে আঙুল চালাচ্ছেন, আর মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত হয়ে মাথা নেড়ে “বাঃ”, “ব্রিলিয়েন্ট”, “চমৎকার” এই সব বলছেন। পড়ার শেষে অনেকক্ষণ সকলে স্তব্ধ হয়ে ব’সে রইলাম। একে “শেষের কবিতা”র মতো বই, আর তাতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পড়া—এর তো আর তুলনা আছে কিনা জানিনে। ডক্টর শীল কেবলি বলতে লাগলেন, “এখনো এই রকম লেখা বেরোচ্ছে? এই বয়সেও? এত অসুস্থ শরীর, তাতেও কিছু আসে যায় না? কী আশ্চর্য!” কবি স্মিতমুখে চুপ ক’রে ব’সে রইলেন।